Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যামিলি ল(পারিবারিক আইন এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেন্জ)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কারিমা বিনতে হোসেইন

রোলঃ 23100120026

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যামিলি ল(পারিবারিক আইন এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেনজ)

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কারিমা বিনতে হোসেইন

রোলঃ 23100120026

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফ্যামিলি ল(পারিবারিক আইন এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেন্জ)" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কারিমা বিনতে হোসেইন, আইডিঃ 23100120026 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফ্যামিলি ল(পারিবারিক আইন এবং আধুনিক সমাজের চ্যালেন্জ)" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

কারিমা বিনতে হোসেইন

আইডিঃ 23100120026

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ঃ ভূমিকা.....6

অধ্যায় ২ঃ ফ্যামিলি ল(পারিবারিক আইন).....7

ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি ও উৎস-.....7

বিবাহ, মোহরানা ও আধুনিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা.....9

দাম্পত্য অধিকার, দায়িত্ব ও আধুনিক কর্মজীবন.....13

সন্তানের জিম্মাদারী ও লালন-পালনঃ.....21

উত্তরাধিকার আইন (সমতা বনাম ইনসাফ).....23

প্রযুক্তি,সোশ্যাল মিডিয়া ও পারিবারিক নৈতিকতা.....25

অধ্যায় ৩ঃ আধুনিক সমাজের চ্যালেন্জ.....28

বাল্যবিবাহঃ.....28

চাকুরীঃ.....29

লিভ টুগেদারঃ.....33

এলজিবিটিকিউ(LGBTQ)ঃ.....34

ফেমিনিজম(নারীবাদ)ঃ.....37

লিবারেল ডেমোক্রেসিঃ.....39

পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়নঃ.....42

সেকুলারিজম(ধর্মনিরপেক্ষতা)ঃ.....43

ডিভাইস আসক্তিঃ.....44

মাদকাসক্তিঃ.....45

মর্ডানিজম(আধুনিকতা)ঃ.....46

ডিপ্রেশন(হতাশা)ঃ.....47

ইসলামোফোবিয়াঃ.....48

মব ভায়োলেন্সঃ.....49

নারী ও পুরুষ সমান অধিকারঃ.....50
অনলাইন সেলিব্রিটিজমঃ.....51
পরকীয়াঃ.....53
সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থাঃ.....54
রিবা(সুদ)ঃ.....56
অধ্যায় ৪ঃ সমাধান এবং তথ্যসূত্র.....57
শরীআ আইন বাস্তবায়নঃ.....57
প্রী ম্যারেজ কাউন্সিলিংঃ.....59
ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনঃ.....60
দেনমোহর আদায় নিশ্চিতকরণঃ.....61
নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রদানঃ.....62
শিক্ষা কারিকুলামে পারিবারিক আইনঃ.....63
পর্দা গাইডলাইনঃ.....65
ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টঃ.....67
সুন্নাহভিত্তিক জীবন পরিচালনাঃ.....69
দাওয়াহঃ.....71
গবেষনার সারসংক্ষেপঃ.....73
তথ্যসূত্র.....76

অধ্যায় ১ঃ ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। পরিবার হলো একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ও মৌলিক একক। কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা পরিবার গঠনকে তাঁর অন্যতম 'নিদর্শন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান আধুনিক সমাজে বিশ্বায়নের প্রভাবে পারিবারিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ মুসলিম পারিবারিক জীবনে যে অস্থিরতা তৈরি করেছে, তা এই গবেষণার মূল প্রেক্ষাপট।

পারিবারিক আইন মূলত বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মতো বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে। তবে গত কয়েক দশকে সমাজব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায় প্রথাগত পারিবারিক আইনগুলো আধুনিক বাস্তবতার সাথে অনেক ক্ষেত্রেই সংঘর্ষে জড়াচ্ছে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা পরিবারকে প্রশান্তি ও ভালোবাসার আধার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন,আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব এবং পশ্চিমা বস্তুবাদী দর্শনের প্রসারে মুসলিম পারিবারিক কাঠামো এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে গত এক দশকে বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩০% থেকে ৪০%। এর পেছনে ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার এবং পারিবারিক আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকাকে দায়ী করা হয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার হলো প্রাচীনতম এবং মৌলিক প্রতিষ্ঠান। মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতেই হযরত আদম (আ.) এবং হযরত হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে একটি পারিবারিক কাঠামোর সূচনা করেছিলেন। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার কেবল একটি সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি একটি ইবাদত এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম: ২১)

অধ্যায় ২ঃ ফ্যামিলি ল(পারিবারিক আইন)

ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি ও উৎস-

ইসলামি পারিবারিক আইন প্রধানত শরীয়াহর উৎসগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই আইনগুলো বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, সতীত্ব এবং উত্তরাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

ইসলামি পারিবারিক আইনের মূল উৎসগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রাথমিক বা মৌলিক উৎসঃ

এগুলো হলো ইসলামের অকাট্য এবং প্রধান উৎস, যেখান থেকে পারিবারিক আইনের মূল কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে।

১. পবিত্র কুরআন: এটি আইনের সর্বোচ্চ এবং প্রথম উৎস। পারিবারিক জীবনের অধিকাংশ মূলনীতি (যেমন: বিবাহের মহর, উত্তরাধিকারের অংশ, ইদ্দত এবং তালাকের নিয়ম) সরাসরি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

২. হাদীস: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাহ বলা হয়। কুরআনের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনাসমূহ হাদিসের মাধ্যমেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে (যেমন: বিবাহের শর্তাবলি বা সন্তানের লালন-পালন)।

মাধ্যমিক বা সহায়ক উৎসঃ

যখন কুরআন ও হাদিসে কোনো বিষয়ের সরাসরি সমাধান পাওয়া যায় না, তখন এই উৎসগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়।

৩. ইজমা: কোনো নির্দিষ্ট যুগে ইসলামের কোনো আইনি বিষয়ে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলেম বা মুজতাহিদগণের ঐক্যমতকে ইজমা বলা হয়।

৪. কিয়াস: কুরআন ও হাদিসের কোনো সদৃশ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নতুন কোনো সমস্যার সমাধান বের করাকে কিয়াস বলে।

৫. ইজতিহাদ: কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে গভীর গবেষণার মাধ্যমে নতুন সমস্যার সমাধান বের করা।

বাংলাদেশে প্রচলিত পারিবারিক আইনঃ

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন মূলত উপরোক্ত উৎসগুলোর ওপর ভিত্তি করে গঠিত হলেও এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে সংবিধিবদ্ধ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ, ১৯৬১: বিবাহ নিবন্ধন, বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম।
মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪: বিবাহের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত।
পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫: পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত।

ইসলামি দর্শনে পরিবার কেবল একটি সামাজিক একক নয়, বরং এটি জান্নাতী জীবনের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার কেবল একটি সামাজিক একক নয়, বরং এটি মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত এবং ইবাদতের অন্যতম ক্ষেত্র। কুরআন ও হাদিসে পারিবারিক বন্ধন রক্ষা এবং সদস্যদের অধিকার আদায়ের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিবাহ, মোহরানা ও আধুনিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা

বিবাহঃ ইসলামি আইন বা শরিয়াহ অনুযায়ী বিবাহ (নিকাহ) কেবল একটি জৈবিক প্রয়োজন নয়, বরং এটি একটি পবিত্র সামাজিক ও আইনি চুক্তি। এটি নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাসকে মহান আল্লাহর নামে বৈধ করে। বিবাহ হলো দুজন মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং বৈধ বন্ধন বা চুক্তি, যার মাধ্যমে তারা দাম্পত্য জীবন, যৌথ পরিবার গঠন সম্পর্কের বৈধতা লাভ করে। এটি বংশগতি রক্ষা, মানসিক স্থিরতা প্রদান এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বিবাহ সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।বিবাহ হলো নারী ও পুরুষের মধ্যকার এমন একটি প্রথাগত সম্পর্ক যা সমাজ ও আইন দ্বারা স্বীকৃত। ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী, বিবাহ হলো একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পাদিত বৈধ চুক্তি বা 'নিকাহ', যা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে থাকার সুযোগ তৈরি করে। বিবাহের মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যকার সম্পর্ক বৈধতা পায় এবং সন্তানরা সামাজিক স্বীকৃতি পায়।বিবাহ পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি, যা সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা তৈরি করে। বিবাহের মাধ্যমেই বংশের ধারা সুশৃঙ্খলভাবে বজায় থাকে। এটি মানুষকে চরিত্র গঠন, পবিত্রতা ও মানসিক স্থিরতা দান করে । বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী মোহরানা বা স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করে । সংক্ষেপে, বিবাহ হলো সমাজ স্বীকৃত একটি পবিত্র বন্ধন যা ব্যক্তিগত জীবনের সুখ এবং সামাজিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষদের বিবাহ সম্পন্ন করো (সূরা আন-নূর, ২৪:৩২) হাদীসে এসেছে,রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নিকাহ (বিবাহ) আমার সুন্নাত; যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১৮৪৬)

মোহরানা: আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অনেক সময় মোহরানাকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামে এটি নারীর অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং তার সম্মানের প্রতীক। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী, মোহরানা হলো বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদত্ত একটি বাধ্যতামূলক উপহার বা অর্থ। এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ও সম্মানের একটি শক্তিশালী

হাতিয়ার।নারীর আর্থিক অধিকার ও নিরাপত্তা মোহরানা নারীর প্রতি কোনো দয়া নয়, বরং এটি তার আইনগত ও ধর্মীয় অধিকার।মোহরানার অর্থের ওপর একমাত্র স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার থাকে। বাবা, ভাই বা স্বামী কেউই এই অর্থ তার অনুমতি ছাড়া ভোগ করতে পারে না।মোহরানা নারীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে, যা সে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা ছোটখাটো বিনিয়োগে ব্যবহার করতে পারে।স্বামী মারা গেলে বা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে, মোহরানা নারীর জন্য প্রাথমিক আর্থিক অবলম্বন হিসেবে কাজ করে।সমাজ যেখানে যৌতুক বা 'পণ' প্রথার অভিশাপে জর্জরিত, সেখানে মোহরানা নারীর আর্থিক মর্যাদা সমুন্নত রাখে। মোহরানা বিবাহের চুক্তিতে নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং তাকে সম্মানের আসনে বসায়। মোহরানা প্রদানের মাধ্যমে স্বামী স্বীকার করে নেন যে, তার স্ত্রী একজন সম্মানিত স্বাধীন সত্তা। এটি বিয়ের চুক্তির একটি অপরিহার্য অংশ। মোহরানা নির্ধারণ ছাড়া বিয়ে অসম্পূর্ণ থেকে যায় (যদিও বিয়ে বাতিল হয় না, তবে মোহরানা আদায় করা বাধ্যতামূলক থাকে)। এটি স্বামীর ওপর একটি আর্থিক দায়িত্ব অর্পণ করে, যা তাকে দাম্পত্য সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবনে সাহায্য করে। এটি কোনো 'মূল্য' নয়, বরং ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে দেওয়া একটি বাধ্যতামূলক উপহার।

মোহরানা আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু আইনি ও ধর্মীয় নিয়ম রয়েছে:

- নগদ ও বাকি (মুয়াজ্জাল ও মুওয়াজ্জাল): মোহরানা নগদে পরিশোধ করা উত্তম, তবে চুক্তির ভিত্তিতে কিছু অংশ বাকি রাখা যায়। তবে স্ত্রী চাওয়ামাত্র তা পরিশোধ করতে স্বামী বাধ্য।
- পরিমাণ নির্ধারণ: মোহরানা নির্ধারণের সময় স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য এবং স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখা হয়। এটি সামর্থ্যের বাইরে হওয়া যেমন অনুচিত, তেমনি খুব নগণ্য হওয়াও ঠিক নয়।
- ক্ষমা করার অধিকার: স্ত্রী চাইলে স্বেচ্ছায় মোহরানা সম্পূর্ণ বা আংশিক মাফ করতে পারেন, তবে এক্ষেত্রে তার ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ করা আইনত ও ধর্মীয়ভাবে দণ্ডনীয়। আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা খুশি মনে (উপহার স্বরূপ) প্রদান করো" (সূরা আন-নিসা, ৪:৪)। বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম পারিবারিক আইনে মোহরানা আদায় না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এটি স্ত্রীর কাছে স্বামীর 'ঋণ' হিসেবে গণ্য হয়।

আধুনিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা ঃ

আধুনিক সমাজের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো যৌতুক প্রথা। ইসলাম যেখানে পুরুষকে মোহরানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে সমাজ নারীকে অর্থ বা সম্পদ দিতে বাধ্য করছে। যৌতুক প্রথা বর্তমান সমাজের একটি চরম ব্যাধি বা অভিশাপ। ইসলামি শরিয়তে যেখানে নারীকে মোহরানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সমাজিক কুপ্রথা হিসেবে নারীর পরিবারের কাছ থেকে অর্থ বা সম্পদ দাবি করা হয়, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বেআইনি।

- নারীর ওপর নির্যাতন: যৌতুকের দাবি পূরণ না হলে গৃহবধূদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।
- আর্থিক দেউলিয়াত্ব: মেয়ের বিয়ের খরচ ও যৌতুক মেটাতে গিয়ে অনেক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।
- মানসিক চাপ: অবিবাহিত মেয়েদের পরিবারের জন্য এটি একটি বিশাল মানসিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা অনেক সময় আত্মহত্যার মতো ঘটনার জন্ম দেয়।
- মর্যাদাহানি: এটি নারীকে একটি 'পণ্য' হিসেবে গণ্য করে, যা তার মানবিক মর্যাদা ও আত্মসম্মানকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

বাংলাদেশের আইন ও দণ্ডঃ

যৌতুক প্রতিরোধে বাংলাদেশে কঠোর আইন রয়েছে। যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী:

- সংজ্ঞা: বিয়ের শর্ত হিসেবে কোনো পক্ষ অপর পক্ষের কাছে অর্থ বা সম্পদ দাবি করলে তা যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে।
- শাস্তি: যৌতুক দাবি করলে, গ্রহণ করলে বা এতে সহায়তা করলে অনধিক ৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা ৫০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।
- মিথ্যা মামলা: কেউ যদি হয়রানি করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা করেন, তবে তার জন্য অনধিক ৫ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে।

বর্তমান সময়ের বিবাহগুলোতে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হয় (যেমন: আলোকসজ্জা, ডিজে পার্টি, কমিউনিটি সেন্টার)। এটি দরিদ্রদের জন্য বিবাহের পথ কঠিন করে দিচ্ছে। বিবাহের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বর্তমানে যে জাঁকজমকপূর্ণ লৌকিকতা ও বিপুল অর্থের অপচয় দেখা যায়, তা ইসলামের সুন্নাহ বা আদর্শ রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিকতার

নামে আমরা এমন এক প্রতিযোগিতায় মেতেছি যা সমাজের জন্য একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- সহজ বিবাহ: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সেই বিবাহ সবচেয়ে বেশি বরকতময়, যা সবচেয়ে সহজে ও কম খরচে সম্পন্ন হয়।"
- খুতবা ও মসজিদে আকদ: সুন্নাহ হলো মসজিদের পরিবেশে অল্প কিছু মানুষের উপস্থিতিতে বিয়ের মূল কাজ (আকদ) সম্পন্ন করা।
- ওয়ালিমা: সামর্থ্য অনুযায়ী বিয়ের পর আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদের খাওয়ানো সুন্নাহ। তবে এতে আভিজাত্য প্রদর্শনের কোনো স্থান নেই।
- মোহরানা ও উপহার: সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে লোক দেখানো ভারী গয়না বা মোহরানার চেয়ে আন্তরিকতা ও সামর্থ্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

বর্তমান যুগে বিবাহ মানেই যেন অর্থের প্রদর্শনী, যা সামাজিক বৈষম্য তৈরি করছে:

- আলোকসজ্জা ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট: লাখ লাখ টাকা খরচ করে স্টেজ সাজানো ও কয়েকদিন ব্যাপী আলোকসজ্জা করা, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।
- খাবারের অপচয়: অনেক পদের খাবার পরিবেশন করা হয়, যার একটি বড় অংশ ডাস্টবিনে যায়। অথচ আশেপাশে অনেক মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে।
- অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান: হলুদ, মেহেদি, সংগীতের মতো অসংখ্য অনুষ্ঠান যা সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক এবং সময়ের অপচয়।
- প্রদর্শনী ও রিয়া: সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের উদ্দেশ্যে দামী পোশাক ও বিলাসবহুল ভেন্যু ভাড়া করা, যা মূলত অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম আড়ম্বরহীন সহজ বিবাহকে উৎসাহিত করে। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "সেই বিবাহই সবচেয়ে বেশি বরকতময়, যা সবচেয়ে সহজ ও অল্প খরচে সম্পন্ন হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ২৪৫২৯; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী)। অপচয় পরিবারগুলোকে ঋণের জালে আবদ্ধ করে এবং বিবাহের পবিত্রতা নষ্ট করে।

দাম্পত্য অধিকার, দায়িত্ব ও আধুনিক কর্মজীবন

দাম্পত্য অধিকার, দায়িত্ব ও আধুনিক কর্মজীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা বর্তমান সময়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাম্পত্য জীবনের সফলতার জন্য পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব পালন অপরিহার্য, যা আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

দাম্পত্য অধিকার ও দায়িত্ব:

পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সম্মান: দাম্পত্য জীবনের সফলতার প্রধান শর্ত একে অপরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা, একে অপরের অনুভূতির মূল্যায়ন করা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা।

স্বামীর দায়িত্ব: স্বামী হিসেবে স্ত্রীর ভরণপোষণ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, এমনকি স্ত্রী ধনী হলেও তার খরচ বহন করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা।

স্ত্রীর দায়িত্ব: সংসারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা এবং সন্তান প্রতিপালনে ভূমিকা রাখা।

আধুনিক কর্মজীবী নারীর ক্ষেত্রে: কর্মজীবী স্ত্রীর উপার্জনের ওপর স্বামীর অধিকার নেই। সংসার চালানো বা স্বামীর আর্থিক দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর চাপানো অনুচিত।

আধুনিক কর্মজীবন ও দাম্পত্যের ভারসাম্য:

কার্যকর যোগাযোগ: কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একে অপরের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এবং সময় কাটানো।

সহযোগিতা: ঘরের কাজে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কের তিক্ততা কমায় এবং আস্থা বাড়ায়।

সময়ের মূল্যায়ন: নিজের কাজের চাপের মধ্যেও সঙ্গীকে সময় দেওয়া এবং একসাথে চলার অঙ্গীকার পূরণ করা।

দাম্পত্য জীবনে কলহ ও মানসিক চাপ দূর করতে পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাই আধুনিক জীবনের মূলমন্ত্র।

বিবাহবিচ্ছেদ (তালাক ও খুলা) সংকট ও সমাধান ঃ
অনেক জায়গায় তালাকের শরয়ী বিধান উপেক্ষা করা হয়। স্পষ্ট তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে অনায়াসে ঘর-সংসার করতে থাকে। এমনও শোনা যায়, তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছে। পরে তালাকদাতা চাপে পড়ে কিংবা মনের টানে মহিলাটিকে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন-যাপন করছে। অথচ এভাবে তালাকপ্রাপ্তাকে ফিরিয়ে আনা এবং একসাথে জীবন-যাপন করা সম্পূর্ণ হারাম।
সমাজে এমনও ঘটে যে, এভাবে হারাম জীবন-যাপনের পক্ষে অনেক প্রগতিবাদী ‘মুরববী’র সমর্থন থাকে। সান্ত্বনার সুরে একেকজন একেক ধরনের উপদেশ দেন আর বলতে থাকেন, আরে রাগের মাথায় তালাক দিলে স্ত্রী তালাক হয় না। অন্তরে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক হয় না। স্ত্রী তালাক দেওয়ার সময় নিজ কানে না শুনলে তালাক হয় না। স্ত্রী যদি তালাকের রেজিস্ট্রি গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয় তাহলে তালাক হয় না। যতক্ষণ স্ত্রী তালাকনামা না পড়বে এবং কবুল না করবে ততক্ষণ তালাক কার্যকর হয় না। শুধু লিখে তালাক দিলে তালাক হয় না, মুখে উচ্চারণ করতে হয়। স্ত্রী গর্ভবতী থাকা অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয় না ইত্যাদি। এভাবে একের পর এর তালাকের ‘সমাধান’ বাতলাতে থাকে। এগুলো সব জাহেল ও মুর্খদের অজ্ঞতাপ্রসূত ও মনগড়া যুক্তি, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে এ সকল ক্ষেত্রেও শুরু থেকেই তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। সুতরাং তিন তালাক দেওয়ার পর এভাবে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার অর্থ হল, প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। তারা যতদিন একসাথে জীবন কাটাবে ততদিন হারাম কাজের মধ্যেই জীবন

অতিবাহিত হবে। এতে শুধু তালাকদাতা এবং তালাকপ্রাপ্তা গুনাহগার হবে না; বরং তাদেরকে এই হারাম জীবন-যাপনের সুযোগ যারা করে দিয়েছে তারাও গুনাহগার হবে।

কেউ কেউ তিন তালাক দেওয়ার পর তা গোপন রাখে। ঘটনাক্রমে দু' একজন জেনে ফেললেও সাক্ষী প্রমাণ না থাকার কারণে সাফ অস্বীকার করে বসে। কখনও কখনও তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার কথা প্রচার করে। এভাবে মিথ্যা বলে তিন তালাকের হুকুম-স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাওয়া- থেকে বাঁচতে চায়। অতঃপর যখন মুফতী সাহেবের কাছে ফতোয়া নেওয়ার জন্য আসে তখন তিন তালাককে দুই তালাক বানিয়ে কাগজে লিখে দেয়। মুফতী সাহেব যেহেতু গায়েব জানে না তাকে লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে, প্রয়োজনে মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে যাচাই করে উত্তর প্রদান করতে হয়। যদি প্রশ্নপত্রে দুই তালাকের কথা উল্লেখ থাকে তাহলে তিনি দুই তালাকের শরয়ী হুকুম অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করবেন। ফলে উত্তরপত্রে দেখা যাবে দুই তালাকের বিধানানুযায়ী মহিলাটি তালাকদাতার জন্য এখনও সম্পূর্ণ হারাম হয়নি। (যদিও কার্যত আল্লাহর বিধানে মহিলাটি তালাকাদাতার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে। কেননা, তাকে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে) এই ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতী সাহেব কোনো ভুল করেননি। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা এখানে খেয়ানত করেছে। সত্যের বিপরীতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তিন তালাককে দুই তালাক বানিয়েছে এবং তিন তালাকের পরিবর্তে দুই তালাকের হুকুম নিয়ে নিয়েছে। যদিও সে মুফতী সাহেবকে ধোকা দিয়েছে এবং হয়তো এই ফতোয়া নিয়ে এলাকাবাসীকেও ধোকা দিবে, কিন্তু আল্লাহকে তো ধোকা দিতে পারবে না। তার সকল কাজ আল্লাহ জানেন। এলাকাবাসীর প্রতিবাদের ভয়ে হয়তো এই ফতোয়াকে সনদ বানিয়ে প্রচার করবে যে, অমুক মুফতী সাহেব কিংবা অমুক বড় মাদরাসা থেকে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। সত্য গোপন করা হবে। সমাজ তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী মনে করবে, কিন্তু শরীয়তের বিচারে মহিলাটি তালাকদাতার জন্য হালাল হয়ে যাবে না; বরং বিধান অনুযায়ী হারামই থাকবে এবং তাদের মেলামেশা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। এই জঘন্য অপরাধের কারণে পরকালে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

কেউ কেউ তিন তালাকের কঠিন হুকুম থেকে বাঁচার জন্য শরীয়তের বিধানের মধ্যে ফাঁক-ফোকর তালাশ করে থাকে। যখন ফিকহে হানাফীতে কোনো ছাড়-মহিলাটিকে পুনরায় গ্রহণ করার সুযোগ-খুঁজে পায় না তখন হানাফী মাযহাব ছেড়ে গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে ধর্ণা দেয়। কারণ তাদের প্রোপাগান্ডা হল, একসাথে একই মজলিসে তিন তালাক দিলেও এক তালাক হয় এবং স্বামী পুনরায় তালাকপ্রাপ্তাকে গ্রহণ করতে পারে।

যারা এই ব্যতিক্রমী মত অনুসরণ করবে তারা নিঃসন্দেহে অবৈধ জীবন যাপন করতে থাকবে। কারণ এই মত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস, শরীয়তের এই চার দলীলের সম্পূর্ণ বিরোধী। এছাড়া সাহাবা, তাবেয়ীন, প্রসিদ্ধ চার ইমাম এবং জুমহুরে উম্মতের অনুসৃত মত ও আমলের পূর্ণ খেলাফ। অতএব গুটি কতক মানুষের ভ্রান্ত মত অনুসরণ করে সারা জীবন হারাম কাজে অতিবাহিত করা নিজের জন্য জাহান্নামের গর্ত খোঁড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের ভুল এই যে, বিবাহের আগে তালাকের মাসআলা ভালোভাবে জানি না এবং জানারও প্রয়োজন বোধ করি না। এমনকি বিবাহের পরও তালাকের মাসআলা জানার চেষ্টা করি না। ফলে এই ভুলের খেসারত পরে দিতে হয়। যদি মাসআলা জানার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হত তাহলে নির্দ্বিধায় তিন তালাক দেওয়ার সাহস হত না এবং সুখের সংসার ভেঙ্গে যেত না। দুই পরিবারের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হত না এবং অনাকাংখিত পরিস্থিতির শিকার হতে হত না। সুতরাং হুট করে তিন তালাক দিতে উদ্যত হবে না। রাগের অবস্থায় ভুলেও তালাকের নাম নিবে না। প্রচন্ড রাগ হলে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করবে। সম্ভব হলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে। তালাক দিলেই যে জীবনে শান্তি ফিরে আসবে এমন তো নয়। তাই ধৈর্য্য ধারণ করাই শ্রেয় এবং শরীয়তের পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা কর্তব্য।

তালাকদাতার জন্য মহিলাটি কখন হালাল হবেঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ হয় এবং সে স্বামীর সাথে তার নিশ্চিত মেলামেশা হয় অতঃপর সেই স্বামী কোনো কারণে স্বেচ্ছায় মহিলাটিকে তালাক দেয় কিংবা স্বামীর মৃত্যু হয় তাহলে মহিলাটি ইদ্দত পালন করার পর পূর্ণ স্বাধীন থাকবে-ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে পারবে। তাকে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহে বাধ্য করা যাবে না; তারা নিজেরা যদি

পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয় তাহলে নতুন মহর ধার্য করে স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় স্বামীকে জোর করে তালাক দিতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ নিষেধ এবং বিবাহের আগে এই শর্ত জুড়ে দেওয়া যে, বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামী অবশ্যই স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য থাকবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেউ যদি এ রকম করে তাহলে সেটা আল্লাহর লানত ও আযাবের কারণ হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি এভাবে (শর্তের সাথে) হালাল করার দায়িত্ব নিবে এবং যার জন্য করবে উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।

বলাবাহুল্য যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষ কখনই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ঘরে উঠানোর জন্য হিলা বাহানার পথ বেছে নিতে পারে না। এটা সুস্থ আকলেরও পরিপন্থী। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ করা কর্তব্য এবং সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

একসাথে তিন তালাকঃ যদি কেউ পূর্বাপর না ভেবে ঠান্ডা মাথায় হোক কি রাগের ঝোঁকে হোক একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে সে একটি মারাত্মক অপরাধ করল এবং এক নিমিষেই একটি সুখের সংসার তছনছ করে দিল। সে নিজেই কৃতকর্মের কুফল টের পাবে। এভাবে তালাক দেওয়া মারাত্মক গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু কেউ দিয়ে ফেললে এই যুক্তি চলবে না যে, সে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়েছে অতএব তা কার্যকর হবে না। কিংবা শুধু এক তালাক হবে। যারা এরূপ ধারণা করেন তারা শরীয়তের বিধান না জানার কারণে করে থাকেন। শরীয়তের বিধান হল, তালাক সংকল্প করে দিক অথবা ঠাট্টাচ্ছলে, খেল-তামাশা করে দিক সর্বাবস্থায় তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। আর স্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়ার সাথে অন্তরের নিয়ত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং যেভাবেই হোক একসাথে তিন তালাক দেওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রীর উপর তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক একটি পরিবারের জন্য চরম সংকটের মুহূর্ত। ইসলামে তালাককে বৈধ করা হলেও একে "সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল" হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে ধৈর্য এবং সঠিক জ্ঞানের অভাবে এই সংকট আরও প্রকট হচ্ছে।

তালাক ও খুলা: মূল পার্থক্য

তালাক এবং খুলা উভয়ই সম্পর্কচ্ছেদের পথ, তবে এদের প্রক্রিয়া ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন:

- তালাক: এটি মূলত স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া বিচ্ছেদ। ইসলামি আইন অনুযায়ী, স্বামী বিশেষ প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন।
- খুলা: এটি স্ত্রীর পক্ষ থেকে চাওয়া বিচ্ছেদ। যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকতে না চান বা কোনো ন্যায্য কারণে আলাদা হতে চান, তবে তিনি মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়া বা নির্দিষ্ট চুক্তির বিনিময়ে বিচ্ছেদ চাইতে পারেন।
- আদালতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ: যদি স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করেন এবং স্ত্রী জুলুমের শিকার হন, তবে তিনি আদালতের মাধ্যমে 'ফাসখ-এ-নিকাহ' বা বিবাহ রদ করতে পারেন।
- নিকাহনামা বা কাবিননামার ১৮ নং কলাম (তালাক-ই-তৌফিজ)
- আধুনিক পারিবারিক আইনের একটি জটিল বিষয় হলো স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা।ইসলামে মূল তালাকের অধিকার স্বামীর। তবে স্বামী চাইলে নির্দিষ্ট শর্তে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দিতে পারেন, যাকে 'তালাক-ই-তৌফিজ' বলা হয়। নিকাহনামা বা কাবিননামার ১৮ নং কলাম মুসলিম নারী অধিকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। একে আইনগত ভাষায় 'তালাক-ই-তৌফিজ' বলা হয়।
- নিচে এর সংজ্ঞা, কার্যকারিতা এবং গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:
- ১৮ নং কলাম কী?
- এটি মূলত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেওয়া একটি আইনি ক্ষমতা। ইসলামি আইন অনুযায়ী তালাক দেওয়ার প্রাথমিক ক্ষমতা স্বামীর থাকলেও, এই কলামের মাধ্যমে স্বামী তার সেই ক্ষমতা স্ত্রীকে হস্তান্তর করতে পারেন।
- ক্ষমতা হস্তান্তর: স্বামী যদি এই কলামে 'হ্যাঁ' লিখে স্বাক্ষর করেন, তবে স্ত্রী বিশেষ পরিস্থিতিতে আদালতের দ্বারস্থ না হয়েই নিজেকে তালাক দেওয়ার (বিচ্ছেদ ঘটানোর) অধিকার লাভ করেন।
- শর্তযুক্ত বা শর্তহীন: এখানে স্বামী নির্দিষ্ট কিছু শর্ত জুড়ে দিতে পারেন (যেমন: স্বামী যদি ভরণপোষণ না দেয় বা ২ বছর নিখোঁজ থাকে)। তবে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি শর্তহীনভাবে প্রদান করা হয়।
- কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

- সাধারণত একজন মুসলিম নারী বিচ্ছেদ চাইলে তাকে 'খুলা' তালাক বা আদালতের মাধ্যমে 'ডিজোলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুযায়ী দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু ১৮ নং কলামে অধিকার থাকলে:
- দ্রুত বিচ্ছেদ: স্ত্রী অত্যন্ত সহজে এবং দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- আর্থিক সুরক্ষা: এই পদ্ধতিতে তালাক গ্রহণ করলে স্ত্রীর মোহরানা পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। (উল্লেখ্য যে, 'খুলা' তালাকে অনেক সময় মোহরানা ত্যাগ করতে হয়)।
- নির্যাতন থেকে মুক্তি: স্বামী অত্যাচারী হলে বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে স্ত্রী এই কলাম ব্যবহার করে নিজের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেন।
- পূরণ করার নিয়ম ও সতর্কতাঃ
- কাবিননামা রেজিস্ট্রি করার সময় এই কলামটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পূরণ করা উচিত:
- স্পষ্টতা: এখানে "স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হইলো" কথাটি স্পষ্টভাবে থাকা জরুরি।
- কাটাকাটি পরিহার: এই কলামে কোনো প্রকার কাটাকাটি বা অস্পষ্টতা থাকলে ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে।
- পরামর্শ: কাজি অনেক সময় এই ঘরটি এড়িয়ে যেতে চান বা 'না' লিখে দেন। সচেতনভাবে এটি 'হ্যাঁ' নিশ্চিত করা কনের আইনি সুরক্ষার জন্য জরুরি।
- একটি ভুল ধারণা

অনেকে মনে করেন ১৮ নং কলামে ক্ষমতা দিলে স্বামীর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা চলে যায়। এটি ভুল। স্বামী তার স্বাভাবিক তালাক দেওয়ার ক্ষমতা হারান না; বরং স্ত্রীকেও একই রকম একটি ক্ষমতা প্রদান করেন মাত্র।

বর্তমান সময়ে সংকটের মূল কারণসমূহঃ

আধুনিক দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধির পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট সংকট কাজ করে:

- ইগোর লড়াই: কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদ বা ভালো উপার্জনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'কে বড়' সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
- যোগাযোগের অভাব: সারাদিন বাইরে কাজের পর বাসায় এসে একে অপরকে সময় না দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকা।

- পারিবারিক হস্তক্ষেপ: স্বামী বা স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের অতিরিক্ত নাক গলানো অনেক সময় ছোট সমস্যাকে বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায়।
- আর্থিক অনৈতিকতা ও পরকীয়া: ডিজিটাল যুগে সহজলভ্য যোগাযোগের কারণে বিশ্বাসভঙ্গ বা পরকীয়া বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ।

সংকট নিরসনে কার্যকর সমাধানঃ

বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি:

১. সমঝোতা বা সালিশঃ কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী, সমস্যা প্রকট হলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক নিযুক্ত করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা উচিত।

২. রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত না নেওয়াঃ অধিকাংশ তালাক ঘটে তাৎক্ষণিক রাগের বশবর্তী হয়ে। ইসলামে এজন্যই এক সাথে তিন তালাক দেওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত) অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে যাতে পুনর্মিলনের সুযোগ থাকে।

৩. কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবধানঃ অফিসের কাজের চাপ বা ক্ষোভ বাসায় সঙ্গীর ওপর ঝাড়া বন্ধ করতে হবে। একে অপরের কর্মক্ষেত্রকে সম্মান করতে হবে।

৪. কাউন্সিলিং ও ধর্মীয় শিক্ষাঃ পারিবারিক কাউন্সিলিং বা ধর্মীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া সংকটের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। অধিকারের চেয়ে একে অপরের প্রতি 'দায়িত্ব' ও 'ত্যাগ'কে প্রাধান্য দিতে হবে।

আইনি সতর্কতা (বাংলাদেশি আইন অনুযায়ী)

মনে রাখা জরুরি যে, শুধু মুখে তালাক বললেই আইনিভাবে বিচ্ছেদ কার্যকর হয় না।

নোটিশ প্রদান: তালাক দেওয়ার পর স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়রকে লিখিত নোটিশ দিতে হয়।

৯০ দিনের সময়সীমা: নোটিশ দেওয়ার পর ৯০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক চূড়ান্ত হয় না। এই সময়ে আপোষের সুযোগ থাকে।

মোহরানা ও খোরপোষ: তালাক যে পক্ষ থেকেই হোক, স্ত্রীর মোহরানা এবং ইদ্দতকালীন খোরপোষ স্বামীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়।

সন্তানের জিম্মাদারী ও লালন-পালনঃ

বিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের পর সন্তানের ভবিষ্যৎ ও মানসিক স্বাস্থ্য সবচাইতে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ে। ইসলামি আইন এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সন্তানের জিম্মাদারী ও লালন-পালনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

১. জিম্মাদারীঃ জিম্মাদারী বলতে সন্তানের দৈনন্দিন দেখাশোনা, নিরাপত্তা এবং লালন-পালনের অধিকারকে বোঝায়।

মায়ের অধিকার: ইসলামি শরিয়াহ এবং বাংলাদেশের পারিবারিক আইন অনুযায়ী, বিচ্ছেদের পর নাবালক সন্তানের জিম্মাদারী প্রাথমিক অধিকার মায়ের।

ছেলে সন্তান: সাধারণত ৭ বছর বয়স পর্যন্ত মা তার কাছে রাখার অধিকার রাখেন।

মেয়ে সন্তান: বয়ঃসন্ধিকাল (পারিবারিক আইনে সাধারণত ১৮ বছর) পর্যন্ত মা তার কাছে রাখার অধিকার রাখেন।

বাবার অধিকার: মা যদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন বা নৈতিকভাবে অযোগ্য প্রমাণিত হন, তবে বাবা সন্তানের জিম্মাদারী চেয়ে আদালতে আবেদন করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, জিম্মাদারী মানেই অভিভাবকত্ব নয়।

২. অভিভাবকত্ব ও ভরণপোষণঃ সন্তানের জিম্মাদারী মায়ের কাছে থাকলেও, আইনত বাবা সবসময়ই সন্তানের 'স্বাভাবিক অভিভাবক'।

- বাবার আর্থিক দায়িত্ব: সন্তান যার কাছেই থাকুক না কেন, সন্তানের যাবতীয় খরচ (খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা) বহন করা বাবার আইনি ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা।
- খরচের সীমা: বাবার সামর্থ্য অনুযায়ী এই খরচ নির্ধারিত হয়। মা যদি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হন, তবুও বাবা সন্তানের খরচ দিতে বাধ্য।
- মা খরচ না পেলে: মা যদি সন্তানের ভরণপোষণ না পান, তবে তিনি পারিবারিক আদালতে 'ভরণপোষণ মামলা' দায়ের করতে পারেন।

৩. দেখা করার অধিকার ঃ সন্তান যে পক্ষের কাছেই থাকুক না কেন, অপর পক্ষের (বাবা বা মা) সন্তানের সাথে দেখা করার এবং সময় কাটানোর পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

- আদালত সাধারণত সপ্তাহে বা মাসে নির্দিষ্ট দিনে দেখা করার সময় নির্ধারণ করে দেয়।
- সন্তানকে অপর পক্ষ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখা আইনত দণ্ডনীয় এবং এটি সন্তানের মানসিক বিকাশে চরম বাধা সৃষ্টি করে।

৪. আধুনিক জীবনের সংকট ও সমাধানঃ আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে বিচ্ছেদের পর সন্তানের লালন-পালনে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়:

- একাকীত্ব ও বিষণ্ণতা: বাবা-মায়ের দূরত্বের কারণে সন্তান হীনম্মন্যতায় ভোগে।
    - সমাধান: বিচ্ছেদ হলেও সন্তানের সামনে একে অপরের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- কর্মজীবী একক অভিভাবক: অফিস সামলে সন্তানকে সময় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
    - সমাধান: পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের (দাদা-দাদি বা নানা-নানি) সাহায্য নেওয়া এবং গুণগত সময় কাটানো।
- সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া: বাংলাদেশের আদালত এখন সন্তানের বয়স ৯ বছরের বেশি হলে তার পছন্দের ওপর গুরুত্ব দেয় যে সে কার সাথে থাকতে চায়।

উত্তরাধিকার আইন (সমতা বনাম ইনসাফ)

উত্তরাধিকার আইন নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'সমতা' এবং 'ইনসাফ' শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবির প্রেক্ষিতে উত্তরাধিকার আইনে ইসলামি বিধানের যৌক্তিকতা প্রায়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

সমতা বনাম ইনসাফ: অনেকে মনে করেন 'সমতা' মানেই 'ইনসাফ', কিন্তু বিষয়টি সবসময় এক নয়।

- সমতা: এর অর্থ হলো গাণিতিক হার সবাইকে সমান অংশ দেওয়া (যেমন: ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান দেওয়া)।
- ইনসাফ: এর অর্থ হলো দায়িত্ব, প্রয়োজন এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ন্যায়নুগ বন্টন করা।

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে সম্পদের বন্টন করা হয়েছে আর্থিক দায়-দায়িত্বের ভিত্তিতে, লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়।

ইসলামি আইনে নারী ও পুরুষের হিস্যাঃ ইসলামে একজন নারী তিনটি ভিন্ন অবস্থায় পুরুষ থেকে কম, সমান বা বেশি সম্পদ পেতে পারেন:

- পুরুষের অর্ধেক পাওয়া: যখন ভাই ও বোন একত্রে উত্তরাধিকারী হয়, তখন বোন ভাইয়ের অর্ধেক পায়। এর কারণ হলো, বোন যে সম্পদ পায় তা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু ভাইয়ের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তাকে নিজের, স্ত্রীর, সন্তানদের এমনকি মা-বাবার (প্রয়োজনে) ভরণপোষণ চালাতে হয়।
- পুরুষের সমান পাওয়া: মা এবং বাবা অনেক ক্ষেত্রে (যেমন: মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে) মৃত সন্তানের সম্পদের সমান অংশ (১/৬ করে) পান।
- পুরুষের চেয়ে বেশি পাওয়া: কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে নারী নিকটাত্মীয়রা পুরুষদের তুলনায় বেশি সম্পদ লাভ করেন।

আধুনিক প্রেক্ষাপট ও ইনসাফের ব্যাখ্যাঃ আধুনিক কর্মজীবনে নারীরাও উপার্জন করছেন, তবুও উত্তরাধিকার আইনে ইনসাফের ধারণাটি নিচের বিষয়গুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে:

- মোহরানা ও খোরপোষ: বিয়ের সময় স্ত্রী মোহরানা পান এবং বিয়ের পর তার যাবতীয় খরচ স্বামীর দায়িত্ব। নারীর নিজস্ব সম্পদ থাকলেও তা সংসারে খরচ করতে তিনি বাধ্য নন।
- পৈতৃক ও বৈবাহিক নিরাপত্তা: একজন নারী তার বাবার বাড়িতে এবং স্বামীর বাড়িতে—উভয় জায়গা থেকেই উত্তরাধিকার পান। কিন্তু একজন পুরুষকে তার পরিবারের সবার দায়িত্ব নিতে হয়।
- নিরাপত্তা বেষ্টনী: যদি কোনো নারী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হন এবং তার সম্পদ না থাকে, তবে তার ভাই বা বাবা তাকে ভরণপোষণ দিতে আইনত ও ধর্মীয়ভাবে বাধ্য। এই বাড়তি সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই পুরুষকে বেশি অংশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রচলিত সমস্যাঃ

আইন থাকা সত্ত্বেও সমাজ ও সংস্কৃতির কারণে কিছু সংকট দেখা দেয়:

- বোনদের বঞ্চিত করা: অনেক সময় ভাইয়েরা 'ভালোবাসার দোহাই' দিয়ে বা জোর করে বোনদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। এটি সম্পূর্ণ হারাম এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।
- সম্পত্তি দখলে রাখা: বাবা মারা যাওয়ার পর ভাইদের মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনে দেরি করা, যা বোনদের জন্য আর্থিক সংকটের কারণ হয়।
- ফরায়েজ সম্পর্কে অজ্ঞতা: সঠিক হিসাব (ফরায়েজ) না জানার কারণে অনেকেই প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

সমাধানের পথঃ

১. আইনি সচেতনতা: মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বণ্টন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১' অনুযায়ী নাতি-নাতনিদের অধিকারও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

২. মানসিকতার পরিবর্তন: সম্পদকে কেবল টাকা হিসেবে না দেখে একে আল্লাহর দেওয়া আমানত ও অধিকার হিসেবে দেখা।

৩. উইল বা হেবা: বাবা-মা যদি চান কোনো সন্তানকে (যেমন: বিশেষভাবে সক্ষম বা অভাবী মেয়ে) বাড়তি কিছু দিতে, তবে তারা বেঁচে থাকাকালীন 'হেবা' বা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের জন্য 'অসিয়ত' করে যেতে পারেন।

প্রযুক্তি,সোশ্যাল মিডিয়া ও পারিবারিক নৈতিকতা

প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক প্রসারের ফলে আধুনিক পারিবারিক জীবনে যেমন সুবিধা এসেছে, তেমনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি হয়েছে। নিচে এই বিষয়ের মূল দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

১. প্রযুক্তির ব্যবহারে নৈতিকতা:

- অপব্যবহার রোধ: প্রযুক্তিকে অন্যের ক্ষতি বা সামাজিক অবক্ষয়ের উপায় হিসেবে ব্যবহার না করা।
- সাইবার বুলিং: সাইবার বুলিং, হুমকি, বা অবৈধ উপায়ে কারো ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ বা প্রকাশ না করা।
- তথ্য নিরাপত্তা: ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং ইন্টারনেটে সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করার সময় সতর্ক থাকা।

২. সোশ্যাল মিডিয়া ও পারিবারিক সম্পর্ক:

- পারিবারিক দূরত্ব: স্ক্রিন টাইম (ফোন/কম্পিউটার ব্যবহার) বেড়ে যাওয়ায় পারিবারিক আলাপচারিতা ও গুণগত সময় কমে যাচ্ছে।
- ডিজিটাল অনুপ্রবেশ: পারিবারিক সম্পর্কের মূল কাঠামোতে সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
- নিরাপদ যোগাযোগ: সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা তথ্য বা গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।

৩. পারিবারিক নৈতিকতার চ্যালেঞ্জ:

- অনলাইন আচরণ: পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রেখে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা ।
- শিশুদের ওপর প্রভাব: শিশুদের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তির আসক্তি থেকে দূরে রাখা।
- সচেতনতা: পরিবারের সদস্যদের সাথে ভার্চুয়াল জগতের চেয়ে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্যের ক্ষতি না করা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বজায় রেখে দায়িত্বশীল আচরণ করাই হলো আধুনিক প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের নৈতিকতা।

প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে পারিবারিক নৈতিকতা ও বন্ধন অটুট রাখার জন্য বাস্তবমুখী কিছু সমাধান নিচে দেওয়া হলো:

১. ডিজিটাল ফ্রি জোন তৈরিঃ

পরিবারের ভেতরে এমন কিছু জায়গা ও সময় নির্ধারণ করা যেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

- খাবার টেবিল: খাওয়ার সময় ফোন দূরে রাখা। এটি একে অপরের সাথে কথা বলার সেরা সময়।
- বেডরুম: ঘুমানোর অন্তত ৩০ মিনিট আগে ফোন বন্ধ করা। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলাপচারিতা বাড়ে এবং ভালো ঘুম হয়।

২. মানসম্মত সময় কাটানোঃ

প্রযুক্তির পর্দার বাইরে একে অপরকে সময় দেওয়া।

- সাপ্তাহিক আড্ডা: সপ্তাহে অন্তত একদিন সবাই মিলে বাইরে ঘুরতে যাওয়া বা ঘরে বসে গল্প করা।
- একত্রে কাজ করা: ঘর গোছানো, বাগান করা বা রান্না করার মতো কাজে পরিবারের সবাই অংশগ্রহণ করা।

৩. অনলাইন নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

প্রযুক্তির সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে পরিবারে খোলামেলা আলোচনা করা।

- শিক্ষামূলক আলোচনা: সাইবার বুলিং, ফিশিং বা অনলাইনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলার ঝুঁকি সম্পর্কে ছোটদের সচেতন করা।
- প্যারেন্টাল কন্ট্রোল: শিশুরা ইন্টারনেটে কী দেখছে তা তদারকি করা এবং ক্ষতিকর সাইটগুলো ব্লক করে রাখা।

৪. ডিজিটাল শিষ্টাচার পালনঃ

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নৈতিক নিয়ম মেনে চলা।

- অনুমতি নেওয়া: পরিবারের কারো ছবি বা তথ্য পোস্ট করার আগে অবশ্যই তার অনুমতি নেওয়া।

- গোপনীয়তা রক্ষা: পারিবারিক একান্ত বিষয়গুলো পাবলিক প্ল্যাটফর্মে শেয়ার না করা।
- সহনশীলতা: অনলাইনে কোনো তর্কে না জড়ানো এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

৫. বড়দের ভূমিকা ও আদর্শ স্থাপনঃ

পরিবারের বড়রা যদি সারাক্ষণ ফোনে ব্যস্ত থাকেন, তবে ছোটরাও তাই শিখবে।

- রোল মডেল: বাবা-মাকে নিজে ফোন ব্যবহারের সময় কমিয়ে সন্তানদের সময় দেওয়ার মাধ্যমে উদাহরণ তৈরি করতে হবে।
- প্রযুক্তির বাইরে শখ: বই পড়া, খেলাধুলা বা ছবি আঁকার মতো সৃজনশীল কাজে সন্তানদের উৎসাহিত করা।

৬. মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়াঃ

প্রযুক্তির আসক্তি অনেক সময় মানসিক অস্থিরতা তৈরি করে।

- খোলামেলা কথা বলা: অনলাইনে কোনো সমস্যা বা হেনস্তার শিকার হলে যেন সন্তানরা ভয় না পেয়ে মা-বাবার কাছে বলতে পারে, এমন আস্থার পরিবেশ তৈরি করা।

অধ্যায় ৩ঃ আধুনিক সমাজের চ্যালেন্জ

আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ বলতে সমসাময়িক বিশ্বে টিকে থাকতে বা উন্নত জীবন যাপন করতে গিয়ে আমরা যে সকল নতুন ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই, সেগুলোকে বোঝায়। আধুনিক সমাজের চ্যালেন্জ এবং সমাধান গুলো তুলে ধরা হলোঃ

বাল্যবিবাহঃ

আধুনিক সমাজ আমাদের শেখায় মেয়েদের নুন্যতম বিবাহের বয়স ১৮ বছর এবং ছেলেদের নুন্যতম বিবাহের বয়স ২১ বছর। মেয়েরা ২০ বছরের আগে বাচ্চা জন্মদান করতে পারবে না। এই নির্ধারিত বয়সের আগে কেউ বিবাহ করলে বা বাচ্চা জন্মদান করলে তখন তা দণ্ডনীয় অপরাধ হয়ে যায়। অথচ ১০,১২ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে, জিনা করছে এবং ডাস্টবিন,ঝোপঝারে নবজাতক শিশু ফেলে রাখছে সেটা যেনো কোনো অপরাধ ই নয়। অপরপক্ষে ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাতাত্ত্বিক বয়স (যেমন ১৮ বা ২১ বছর) সরাসরি নির্ধারণ করা হয়নি। বরং ইসলামে বিবাহের যোগ্যতা নির্ধারিত হয় শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার ভিত্তিতে। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বিবাহের বয়স সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

সাবালকত্ব (বুলুঘ): বিবাহের জন্য প্রথম শর্ত হলো ছেলে ও মেয়েকে 'বালেগ' বা সাবালক হতে হবে। সাধারণত শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে সাবালকত্ব নির্ধারিত হয়। যদি কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে সর্বোচ্চ ১৮ বছর এবং ইমাম শাফেয়ীর মতে ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাকে বালেগ ধরা হয়।

মানসিক পরিপক্কতা (রুশদ): কেবল শারীরিক সাবালকত্বই যথেষ্ট নয়, সংসার পরিচালনার মতো মানসিক সক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতা বা 'রুশদ' থাকাও আবশ্যক।

সম্মতি: ইসলামে জোরপূর্বক বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় অভিভাবকের মাধ্যমে বিয়ে হলেও, সাবালক হওয়ার পর সেই বিয়ে রাখা বা না রাখার অধিকার (খায়ারুল বুলুঘ) ব্যক্তির থাকে।

সামর্থ্য: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে"। এখানে সামর্থ্য বলতে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি আর্থিক ও মানসিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাকে বোঝানো হয়েছে ।
সংক্ষেপে, ইসলামে 'বাল্যবিবাহ' বলে আলাদা কোনো বিধান নেই; বরং 'বালেগ' বা পরিপক্ক হওয়ার পর বিবাহের কথা বলা হয়েছে ।

চাকুরীঃ

একটা হল 'জেনারেল সামাজিক ট্রেন্ড'। আরেকটা হল বিশেষ প্রয়োজন। অনেকেই বিশেষ বিশেষ সিনারিও দিয়ে প্রশ্ন করে এমন হলে মেয়েটা কীভাবে চলবে?' 'তালাক দিলে মেয়েটা কীভাবে চলবে?'। এগুলো বিশেষ সিনারিও যার সমাধানও বিশেষ। শরীয়া আদালত থাকলে ব্যক্তির বিশেষ সিচুয়েশন বিবেচনায় কাজী বিশেষ সমাধান বাতলান। যেমন, ফতোয়া আলমগীরীতে এসেছে, স্বামী যদি ভরণপোষণ দিতে না পারেন, তবে স্ত্রীকে উপার্জনের সুযোগ দিতে স্বামীকে বাধ্য করা হবে। যেহেতু শরীয়া নেই, ব্যক্তিগত সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে আলিমদের সাথে বসলে বিভিন্ন রাস্তা রয়েছে। কিন্তু সেটা কখনোই জেনারেল ট্রেন্ড হবে না। একই কথা এই সিস্টেমে উচ্চশিক্ষার নামে কালক্ষেপণের ক্ষেত্রেও। সেটা গণহারে হবে না, অহেতুক হবে না, নারীর মূল ভূমিকাকে গৌণ করবে না। কেউ কেউ যোগ্যতা অনুসারে সহশিক্ষামুক্ত পরিবেশে উচ্চশিক্ষা নেবে। কিন্তু সেটা ট্রেন্ড হবে না। ট্রেন্ড হবে 'মাতৃশিক্ষা'। 'প্রয়োজনে' পর্দার সাথে পেশাগ্রহণের অনুমতি নারীর জন্য রয়েছে। কিন্তু উপনিবেশের মওকায় নারীবাদের দরুন এটা জেনারেল ট্রেন্ড হয়ে গেছে। নারীবাদের এজেন্ডা হল পাবলিক স্ফিয়ারে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় আসা। আপনি ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিং করে কোটি টাকা কামালেও আপনাকে তারা পরাধীনই বলবে, যেহেতু আপনি পাবলিক স্ফিয়ারে পুরুষের প্রতিযোগী হচ্ছেন না। এটা জেনারেল ট্রেন্ড হবার ফলে কী কী স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হচ্ছে, আমি সেটা বলার চেষ্টা করছি।
শারীরিক গঠনের পার্থক্য এমনভাবে এসেছে, যাতে নারী-পুরুষের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য আলাদা হয়ে গেছে। পুরুষ বাইরে প্রতিকূলতা চষে বেড়াবে, জীবিকা আনবে, প্রতিপত্তি দিয়ে নারী-শিশুর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে। আর নারী ঘরে অনুকূল

পরিবেশে সন্তান সামলাবে, সন্তানকে স্বাবলম্বী মানব হিসেবে জীবনযুদ্ধের জন্য রেডি করবে। এটা হচ্ছে আমাদের বায়োলজিক্যাল ভূমিকা। জেন্ডার রোল পুরোটাই সমাজ শেখায় না। আমাদের দেহমনের নকশার ভেতরে আছে জেন্ডার রোল।

৯টা-৫টা চাকুরির নামে বায়োলজিকে অস্বীকার করে নারীরা নিজেদের অসুস্থ করে ফেলছে, পরবর্তী প্রজন্মকে অসুস্থ করে ফেলছে। কীভাবে সেটা দেখবো সামনের পোস্টে। নারীদের গণহারে চাকরিতে আসার দ্বারা লাভবান হয় কিছু লোভী পুরুষ, লোভী স্বামী। আর লুজার হয় নারী নিজে। সেই লসের মাশুল সে দিবে নিজ শরীরের অসুস্থতা দিইয়ে, মানসিক অস্থিরতা দিয়ে, সন্তানের সাথে দূরত্ব দিয়ে এবং সন্তানের অবিকাশ দিয়ে। বিনা প্রয়োজনে নারীর চাকুরির মানসিকতায় ভুক্তভোগী নারীই, অন্য কেউ না।

নারীকে গণহারে (বিনাপ্রয়োজনে) চাকুরিতে আসতে উদ্বুদ্ধ করার যে ট্রেন্ডটা, সেটা পুরুষ তৈরি করেছে পুঁজিপতি পুরুষেরই সুবিধার্থে।

নারীকে পুঁজিবাদের ওয়ার্কফোর্সে টেনে আনার একটা ফাঁদ এই স্বাবলম্বিতা, এই ক্ষমতায়ন, এই চাকরির টোটকা। একটু চিন্তা করুন, চাকরির বাজারে শুধু পুরুষ। এবার চাকরির বাজারে সমান সংখ্যক নারী চলে এল। শ্রমের যোগান বেড়ে গেল। চাহিদার চেয়ে যোগান বেড়ে গেলে মূল্য কমে যায়। শ্রম হয়ে গেল সস্তা। কার লাভ? ভাবুন তো? । যাদের লাভ, 'নারী, চাকরি করো'— এটাও তাদেরই বুলি।

তাদের— নারীশিক্ষা মানে শিক্ষিত হয়ে চাকুরিতে আসো।

নারী অধিকার মানে ঘরের বাইরে চাকুরি করার অধিকার,

নারীর ক্ষমতায়ন মানে চাকুরি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।

নারী স্বাধীনতা মানে পরিবারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে চাকরি করার স্বাধীনতা।

নারী, তোমার স্বামী তোমার উপর জুলুম করে, ডিভোর্স দিয়ে চাকরি কর, সমাধান।

তোমার উপর ম্যারিটাল রেপ হয়, চাকরি করো।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তোমার ভালো চায় না, চাকরি করো।

সব কিছুর সমাধান হলো, চাকরি করো, অর্থনীতিতে আসো, টাকা কামাও। আমার কাজে লেগে যাও। ব্যস। এটাই সমাধান। এটাই আলাদিনের জাদুর চেরাগ।

কেননা নারীদের শ্রমবাজারে রাখাটা পুঁজিপতিদের পক্ষে ব্যাপক লাভজনক। এতে চাকুরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। মেয়েদের জন্য চাকরি অপশনাল, আর পুরুষের তো 'না হলেই নয়'। ফলে, পুরুষরা আগের চেয়ে কম বেতনেও শ্রম দিতে তৈরি থাকে।

১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। (Hernandez 1993, Zill & Nord 1994) । বাংলাদেশে আজও সরকারি হিসেবেই ২৬ লক্ষ পুরুষ বেকার, যাদের চাকরি প্রয়োজন। আজকে আপনার বেকারত্বের পিছনে, কম বেতনে বেশি খাটার পিছনে এইসব নারীবাদী পলিসি দায়ী। মার্কেটে একটা কৃত্রিম প্রতিযোগিতা তারা তৈরি করে রেখেছে। পুঁজিপতিরা তো চায়, বেতন কম দিলে পুঁজিপতির পকেটে মুনাফা থাকবে বেশি। তাহলে নারীদের এখন শ্রমবাজারে ধরে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। আর নারীদের শ্রম ধরে রাখতে হলে করতে হবে তিনটি কাজ—

পরিবার গঠন-কে পেছাতে হবে স্বাবলম্বী হবার নামে। নারীদেরকে পরিবারমুখী থেকে ক্যারিয়ারমুখী করতে হবে। চাকরি, ক্যারিয়ার—এসবকে মর্যাদার কাজ হিসেবে বুঝাতে হবে। 'আগে আগে বিয়ে'-কে ভিলেন বানাতে হবে। বিয়ে, গর্ভধারণ, বাচ্চাপালন-কে ছোট ও ঘৃণ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেন এগুলো করতে নারী অনীহা বোধ করে।

নারীকে তার জেন্ডার রোল থেকে বাইরে বের করে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দিতে হবে। সম্ভবত ম্যাক্স ওয়েবারের একটা কথা আছে: যেকোনো ঘটনা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল। পলিসি করার সময়, একটা জেনারেল সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান প্রস্তাব করা হয়। সেটাই করছি। পূর্ণাঙ্গ সমাধান অবশ্যই মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল। মেয়েদের যে চাকরি করার গণট্রেন্ড, এটা সোজাসাপ্টা জিনিস না। এর অর্থনৈতিক কারণ আছে, পলিটিক্স আছে, দর্শন আছে, সোশ্যাল ডাইনামিক্স আছে। সব করতে গিয়ে নারীর বায়োলজি মাইর খেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক হারে নারীদের চাকরিতে প্রবেশ করা যেনো এক নব্য ফিতনায় পরিনত হয়েছে। আজ থেকে ১০ বছর আগেও সচ্ছল নারীদের চাকরিতে দেখা যায় নি। কিন্তু এখন ৭০% পরিবারেই সচ্ছলতা থাকার পরেও নিজের পায়ে দাঁড়ানো, সেল্ফ ইনডিপেনডেন্স কে পুঁজি করে নারীরা চাকরিতে প্রবেশ করছে। এর জন্য বেকারত্বের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব কিছুই হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের আদলে। পশ্চিমা বিশ্ব দুনিয়াকে শেখায় নারীদের পুরুষদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে কাজ করতে। কিন্তু ইসলাম নারীকে করেছে ঘরের রানী,দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা। নারীর সব কিছুর দায়িত্ব পালন করবে তার বাবা,স্বামী,ভাই অথবা ছেলে। নারী কে সৃষ্টি ই করা হয়েছে সন্তান লালন- পালন, ঘরের ভিতরের কাজ-কর্ম করার জন্য। একজন নারী কখনোই একজন পুরুষের কাজ করতে পারবে না। ইসলামে নারীদের চাকরি বা

উপার্জনের সুযোগ রয়েছে, তবে তা অবশ্যই ইসলামি শরিয়তের পর্দা ও শালীনতার বিধান মেনে হতে হবে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশামুক্ত এবং পর্দা বজায় রেখে উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করা জায়েজ। তবে সংসারের মূল দায়িত্ব ঘরের ভেতর এবং স্বামীর পরিবার দেখাশোনা করা, তাই কাজের ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান দায়িত্ব বিঘ্নিত না হওয়ার শর্ত রয়েছে।

ইসলামে নারীদের চাকরির বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনাবলি:

- শর্তসাপেক্ষ অনুমতি: নারীর ওপর উপার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই; তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষদের (বাবা, ভাই বা স্বামী)। তবে প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকলে উপযুক্ত পরিবেশ ও মাহরামের অনুমতি নিয়ে তারা কাজ করতে পারেন।
- কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ: নারীরা এমন কর্মক্ষেত্রে কাজ করবেন যেখানে পর্দার বিধান পূর্ণ বজায় থাকে এবং পরপুরুষের সাথে একাকী নির্জনে অবস্থান (খেলওয়াত) করতে হয় না।
- পেশা নির্বাচন: নারীদের জন্য উপযোগী পেশা, যেমন—নারী শিক্ষা, নার্সিং, চিকিৎসাসেবা বা ঘরে বসে করা যায় এমন কাজ (যেমন সেলাই) উত্তম।
- পর্দা ও শালীনতা: কর্মক্ষেত্রে বাইরে যাওয়ার সময় অবশ্যই হিজাব বা পর্দা পরিধান করতে হবে এবং অহেতুক সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পরিবার ও কর্মের ভারসাম্য: চাকরির কারণে যাতে স্বামীর খেদমত, সন্তানের লালন-পালন ও ঘরের প্রধান দায়িত্ব অবহেলিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।
- সফর: মাহরাম (যাদের বিয়ে করা হারাম) ছাড়া কোনো নারী চাকুরি বা অন্য প্রয়োজনে দীর্ঘ সফর করতে পারবেন না।

মূলত, ইসলাম নারীকে অসম্মান করে না বা উপার্জনে বাধা দেয় না, বরং নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে কিছু শর্ত আরোপ করেছে, যাতে কাজের মাধ্যমে তার দ্বীন বা ইজ্জতের ক্ষতি না হয়।

লিভ টুগেদারঃ

আধুনিক সমাজে লিভ টুগেদার যেনো এক অন্যতম পাপাচার। পশ্চিমা বিশ্বে যেমন বিয়ে ছাড়া ই নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা করে, একসাথে স্বামী স্ত্রীর মতো থাকে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে তা আজ ছড়িয়ে পরেছে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে লিভ টুগেদার বা বিবাহবহির্ভূত একত্রে বসবাস করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবিরা গুনাহ। ইসলামি শরিয়তে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র বৈধ মাধ্যম হলো 'নিকাহ' বা বিবাহ।

ইসলামে লিভ-ইন রিলেশনশিপের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য নিচের পয়েন্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ:

- জিনা বা ব্যভিচার: বিয়ের আনুষ্ঠানিক বন্ধন ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করাকে ইসলামি পরিভাষায় 'জিনা' বলা হয় । কোরআনে জিনাকে অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট পথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- নির্জনে অবস্থান (খেলওয়াত): কোনো পরপুরুষ ও পরনারী নির্জনে একাকী অবস্থান করা ইসলামে নিষিদ্ধ, কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যেখানে একজন পুরুষ ও নারী নির্জনে থাকে, সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান উপস্থিত থাকে।
- সামাজিক ও আইনি ভিত্তি: ইসলামে বিবাহ কেবল শারীরিক সম্পর্ক নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও আইনি চুক্তি যেখানে উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত থাকে । লিভ-ইন রিলেশনশিপে এ ধরনের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা বা উত্তরাধিকারের অধিকার থাকে না ।
- সন্তানের পরিচয়: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ফলে জন্ম নেওয়া সন্তান ইসলামি আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে এবং সামাজিকভাবে মর্যাদা সংকটে পড়তে পারে।
- আদালতের পর্যবেক্ষণ: সাম্প্রতিক বিভিন্ন রায়ে (যেমন—ইলাহাবাদ হাইকোর্ট) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামি আইন অনুযায়ী বিবাহিত কোনো ব্যক্তি অন্য কারো সাথে লিভ-ইন রিলেশনশিপে থাকার অধিকার দাবি করতে পারেন না, কারণ ইসলামে এর কোনো অনুমোদন নেই। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো একটি

সুস্থ ও পবিত্র সমাজ গঠন করা, যেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্ক হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আইনি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে।

এলজিবিটিকিউ(LGBTQ)ঃ

L= Lesbian

G= Gay

B= Bisexual

T= Transgender

Q= Queer

পশ্চিমা সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে সমকামীতা,ট্রান্সজেন্ডার,গে,লেসবিয়ান, চর্চা করে আসলেও বিগত ৫/৬ বছর যাবত বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে খুব সুক্ষ্ম ভাবে বাচ্চাদের ব্রেইনে প্রবেশের পায়তারা চলছে। জেন্ডার একটি কুফরি শব্দ। আগে দুইটা শব্দ বুঝতে হবে। পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনই হল 'শব্দ নিয়ে খেলা'। শুনতে শোনা যায় একরকম, বাস্তবে আরেক রকম। পশ্চিমা নষ্টামি থেকে বাঁচতে চাইলে যেকোনো নতুন শব্দ শুনেই বিশ্বাস করবেন না। আগে শব্দটা গভীরভাবে বুঝা চাই।

যদি বাবু মেয়ে হতো, তবে তার জন্য মেয়েদের ড্রেস কেনা হত, পুতুল-রান্নাসেট কেনা হতো, চুল বড় করানো হত, কান ফোঁড়ানো হত। আশা করা হতো: তার কণ্ঠ হবে চিকন, শরীর হবে নারীসুলভ, সে একটা ছেলেকে বিয়ে করবে।

নাস্তিক, এক্স-নারীবাদী ও নিউরোসায়েন্টিস্ট ড. ডেবরা সোহ বলছেন: ৯৯% লোকের (জন্মগত লিঙ্গ) আর জেন্ডার (লিঙ্গের সামাজিক ধারণা) একই। [The End of Gender]

তাহলে মাত্র ১% লোকের জন্য লিঙ্গ-এর ধারণাই বদলে কেন ফেলতে হবে? কারও কারও হাতে ৬টা আঙুল থাকতে পারে। তাই বলে, হাতের ধারণা (৫ আঙুলবিশিষ্ট) বদলে দিতে হবে? এজন্য বলা যৌক্তিক যে, হাতের কোনো আঙুল হয় না? তুমি

যতগুলা ভাবো, তোমার আঙুল ততগুলাই? এর ফলে কেউ ভাবছে, তার আঙুল ৩টা, অতএব দুটো আঙুল কেটে ফেলার জন্য সে সার্জারি করাচ্ছে?

'জেন্ডার' শব্দটাই পশ্চিমা অসভ্যতার হেজিমনির (আগ্রাসনের) হাজারও অস্ত্রের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। লিবিয়ার আলিমগণ সম্প্রতি সম্মিলিত ফতোয়া দিয়েছেন: 'জেন্ডার' শব্দটা ব্যবহার হারাম। এই শব্দটা মুসলিম সমাজে বিকৃত যৌনতার দুয়ার খুলে দেয়। মুসলিম নারীকে পশ্চিমা পুঁজিবাদের পণ্যে পরিণত করে। আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করাকে। বৈধতা দেয়। আল্লাহর ভুল সৃষ্টিকর্তা বলে দাবির জায়গা দেয়।

পুরুষ সমকামী, নারী সমকামী, উভকামী ও রুপান্তরিত লিঙ্গ (এলজিবিটি) ও তাদের অভিজ্ঞতার প্রতি মুসলিম বিশ্বের আচরণ ধর্মীয়, আইনগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কুরআনে লূতের সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা পুরুষদের মধ্যে পারস্পারিক যৌনকর্ম সংঘটনের কারণে আল্লাহর ক্রোধের মাধ্যমে ধ্বংস হয়েছিল। হাদিসেও সমকামী ও রুপান্তরকামী আচরণকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং পুরুষ সমকামীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড ও রুপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তিদের নির্বাসনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সমকামী আচরণ প্রচলিত ইসলামী নিয়মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং পরিস্থিতি ও ফিকহী মাজহাব অনুসারে মৃতুদণ্ডসহ বিভিন্নভাবে শাস্তিযোগ্য। তবে উত্তর-আধুনিক ইসলামী সমাজে সমকামী সম্পর্ক সহনীয় ছিল, এবং ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র হতে বোঝা যায় যে, এই আইনগুলোর প্রয়োগ ছিল অপ্রতুল, প্রধানত ধর্ষণ ও সামাজিক নৈতিকতার অন্যান্য বিশেষ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে। ইসলামী যুগের প্রথম দেড় শতাব্দী যাবৎ ইসলামী সমাজে সমকামী চর্চার কথা তেমন একটা পাওয়া যায় না।

অষ্টম শতাব্দী হতে আধুনিক যুগ অবধি বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী কবিতা ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যধারায় সমকামোদ্দীপক ভাবধারা গড়ে ওঠে।প্রাচীন ইসলামী রচনায় প্রাপ্ত সমকামিতার ধারণা গ্রিক-রোমান পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে যায়, যা যৌন অভিমুখিতার আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা হতে আলাদা। উসমানীয় সাম্রাজ্যে ও মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র সমকামিতার প্রতি সামাজিক আচরণ ১৯ শতকের পর থেকে সমসাময়িক ইউরোপে প্রচলিত যৌনতার ধারণা ও সামাজিকতার প্রভাব এবং ওয়াহাবিবাদের ন্যায় বিভিন্ন ইসলামী মৌলবাদী মতবাদের বিস্তারের কারণে নেতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গমন করে, এবং সমকামিতাকে অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক বলে মনে করা হতে

থাকে। বহু ইসলামী দেশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন থাকাকালে সমকামিতার জন্য অপরাধমূলক শাস্তির প্রবর্তন করে।

সাম্প্রতিক সময়ে, ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে সমকামীদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ বিরাজ করছে সামাজিক ও আইনগতভাবে, যা ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীল আচরণ এবং ইসলামপন্থী আন্দোলনসমূহের উত্থানের কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আফগানিস্তান, ব্রুনাই, ইরান, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, সোমালিয়ার কিছু অংশ,সুদান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেনে, সমকামী কর্মকাণ্ডের ফলে মৃত্যুদণ্ড] বা কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। অন্যান্য দেশ, যেমন, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, কাতার, সোমালিয়া ও সিরিয়াতে এটি অবৈধ, এবং এর জন্য শাস্তি দেওয়া হতে পারে।সমলিঙ্গীয় যৌনসঙ্গম আলবেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, বুর্কিনা ফাসো, জিবুতি, গিনি-বিসাউ, ইরাক, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কিরগিজস্তান, মালি, নাইজার, তাজিকিস্তান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়ার সিংহভাগ, এবং উত্তর সাইপ্রাসে বৈধ। কুয়েত, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানে নারীদের মধ্যে সমকামী সম্পর্ক বৈধ কিন্তু পুরুষদের মধ্যে সমকামী সম্পর্ক অবৈধ।

অধিকাংশ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অথবা উএনএইচআরসির সভায় এলজিবিটি অধিকার বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে। ২০১৬ এর মে মাসে, ৫১টি মুসলিম দেশের একটি দল ১১টি সমকামী ও রুপান্তরকামী সংস্থার ২০১৬ সালের এইডস প্রতিরোধের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে।তবে, আলবেনিয়া, গিনি-বিসাউ ও সিয়েরা লিয়ন এলজিবিটি অধিকারের সমর্থনে জাতিসংঘের একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। আলবেনিয়া, কসোভো ও উত্তর সাইপ্রাসে এলজিবিটি বৈষম্যবিরোধী আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু মুসলিম সংগঠন রয়েছে যে গুলো এলজিবিটি মুসলিমদের যৌন অভিমুখিতা পুনর্গঠনে অথবা তাদের জন্য এলজিবিটি অধিকার সমর্থনে কাজ করে।



ছবিঃ সমকামী, এলজিবিটিকিউ, ট্রান্সজেন্ডারদের Symbol(চিহ্ন)।

ফেমিনিজম(নারীবাদ)ঃ

নারীবাদ হচ্ছে এমন একটি শব্দ যা দ্বারা বোঝানো হয় একদল নারী যারা নারীদের অধিকার কিংবা নারীদের স্বাধীনতা চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা সভ্যতা নারী অধিকার চায় না। তারা চায় ব্যবসা। নারীবাদ নারীকে অধিকার দেয় না (যদিও নারীরা মনে করে নারীবাদ তাদের অধিকার দেয়)। নারীবাদী অধ্যাপক ন্যান্সি ফ্রেজার তাঁর 'Is Feminism the handmaiden of Capitalism' আর্টিকেলে দেখিয়েছেন। বরং নারীবাদ নারীকে ১ম বিশ্বের ব্যবসায় পরিণত করে। নারীকে ভোগবাদী করা হয়, স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদী সমাজবিচ্ছিন্ন স্বার্থপর করে ফেলা হয়। এবং নারীকে দিয়ে কৃত্রিম চাকরি সংকট তৈরি করে শ্রমকে কমদামী করে রাখা হয়। নারীর উপর দ্বৈত ভূমিকা চাপিয়ে তাকে শারীরিক-মানসিকভাবে অসুস্থ করে ফেলা হয়। অধিকারের লোভ দেখিয়ে আরোপ করা হয় এক্সট্রা কর্তব্য। গোয়েবলস বলেন:
"প্রোপাগান্ডা সবচেয়ে ভাল কাজ করছে বুঝবেন যখন দেখবেন যাদেরকে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, আর তারা ভাবছে যে, আমরা যা করছি নিজ ইচ্ছাতেই করছি"।

১ম ওয়েভ পশ্চিমা নারীর অধিকারের জায়গা থেকে শুরু হলেও ২য় ওয়েভ থেকে নারীবাদ আর নারীর নিয়ন্ত্রণে নেই। নারীবাদ নিয়ন্ত্রণ করে কর্পোরেট পুঁজিবাদী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। কেউ যদি বলে আমি নারী অধিকারের কথা বলি, নারীবাদও নারী অধিকারের কথা বলে, তাই একইরকম শোনায়। ভুল কথা। সেকেন্ড ওয়েভ 'নারী অধিকারের' নামে নারীকে শোষণ করার কথা বলে।

পুরুষের সমান হতে পাঠানো একজন নারীর বডি-সাইকির উপর অত্যাচার। তাকে আপনি খুব মোটিভেট করে পাঠাতে পারবেন, কিন্তু তা অত্যাচার। নারীকে তার বডি-সাইকির অনুকূল রোল থেকে পুরুষের রোলে এসাইন করা তার উপর অত্যাচার। খুব গ্লোরিফাই করলেই তার ক্ষতি 'নাই' হয়ে যাবে না। ফেমিনিজম দিয়ে ক্যাপিটালিজম এই কাজটাই করে। নারীর বডি-সাইকি-নিউরোফিজিওলজি যে বিশেষ রোল প্লে করার জন্য তৈরি, সেখান থেকে তাকে আরেক ভূমিকায় নামায়, যা তার দেহ-মনের বিপরীত। এবং এর ফল ভালো হবার নয়।

স্বামী কামাই করবে, আর নারী বাসায় থাকবে, এটা তার অধিকার। স্বামী তার ভরণপোষণ সাধ-আহ্লাদ পূরণ করবে, এটা তার অধিকার। সন্তানপ্রসবের সময় এবং দুধপানের ফলে যে বিপুল অক্সিটোসিন-জাত বাৎসল্য টান, সে ফিজিওলজির টান ছিন্ন করে সে বাইরে থাকবে না, নিজ সন্তানের আশেপাশে থাকবে, এটা তার অধিকার। প্রয়োজনে চাকরি করলেও পুরুষের সমান করবে না, কম করবে, কম শ্রম করবে, বেতনও কম পাবে। পুরুষের মত সমতা নারীর অধিকার নয়। বরং নারীর শরীর-মন-চাহিদা অনুপাতে বিশ্রাম পাবে, কম কর্মঘণ্টা কাজ করবে, মাসিক অসুস্থতায় ছুটি পাবে, নারী নারীর পরিবেশে মন খুলে নিঃসংকোচে ফুল ফ্লারিশমেন্টের সাথে কাজ করবে। এটা নারীর অধিকার। সমতা নারীর জন্য জুলুম। নারীবাদী রা বিয়ে টার্ম টাকেই ঘৃনা করে। সংসার করা,স্বামীর আনুগত্য করা, বাচ্চা জন্ম দেয়া এসব কিছু ই তাদের কাছে মনে হয় স্বাধীনতায় বাধা দেয়া হচ্ছে। তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে।

লিবারেল ডেমোক্রেসিঃ

এর অর্থ হচ্ছে উদার গনতন্ত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে লিবারেল ডেমোক্রেসি বা উদার গণতন্ত্রচর্চা না করার ফল বলে মনে করছেন কেউ কেউ। তাদের মতে, এ ব্যবস্থায় শাসক যতই নিপীড়ক হোক, নির্বাচন সুষ্ঠু হলেই তাঁকে সরতে হবে। ক্ষমতা যেহেতু চিরস্থায়ী নয়; দানবীয় শাসন দীর্ঘদিন চলতে পারবে না। একই সঙ্গে আইন আদালত ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতার মর্জির কাছে সমর্পিত হবে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। লিবারেল ডেমোক্রেসির পশ্চিমা তাত্ত্বিকরাও মুক্তবাজার, বহুদলীয় রাজনীতি ও মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন। বাস্তবে গণতন্ত্রের এ ধারা কতটুকু জনবান্ধব ও জীবনঘনিষ্ঠ, সে বিশ্লেষণও জরুরি।

উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বহুদলীয় রাজনীতির কথা বলা হলেও বাস্তবে প্রায় সব জায়গায় দুই দলের রাজনীতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। উদার গণতন্ত্রের সূতিকাগার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তো বটেই, অপেক্ষাকৃত নবীন ভারতেও ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রাধান্য দুটি দলের। এ দেশগুলোতে ‘এক ব্যক্তির এক ভোট’– এ সমতা থাকলেও ভোটের রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে কিছু গোষ্ঠী। মিডিয়া, অর্থ ও নির্বাচনী প্রচার– কোনো কিছুই জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। জনগণ ভোট দেয় বটে, কিন্তু নিজের চিন্তাশক্তির চেয়ে তা বরং মিডিয়ার প্রচার বা অর্থের প্রভাবের ওপর নির্ভর করে। এতে শাসক বদলায় কিন্তু শাসন ব্যবস্থার বদল হয় না। অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে। আমলাতন্ত্র, সামরিক ও করপোরেট প্রভাব অপরিবর্তিত থাকে। ফলে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন এখানে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। গণতন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণতি যদি নিছক শাসক বাছাই হয়, তাহলে তাকে ভোটতন্ত্র বলাই শ্রেয়।

অর্থনীতিকে বলা হয় রাষ্ট্রের ভিত্তি; রাজনীতি পরিচালন পদ্ধতি বা উপরিকাঠামো। অর্থনীতিতে নৈরাজ্য দূর না হলে রাজনীতি ঠিক করা কতটুকু সম্ভব? উদার গণতন্ত্রে সম্পদের সুষম বণ্টন, জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য নিরসনের বিষয় গুরুত্ব পায়, এটা সত্য। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারকে উন্মুক্ত করতে গেলে বহুজাতিক কোম্পানিকে স্থানীয় বাজারে প্রবেশাধিকার দিতে হয়। বহুজাতিক কোম্পানি পুঁজির সঙ্গে নিয়ে আসে শর্তের বোঝা। এ ক্ষেত্রে অনেক সেবামূলক খাতকেও ধাপে ধাপে বাজারের হাতে অর্থাৎ কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিতে

হয়। এ অবস্থায় রাজনীতির নির্ভরশীলতা পুঁজির মালিকের ওপর বাড়তে বাধ্য। ফলে শ্রেণিবৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়।

উদার গণতন্ত্র বলে– 'ফ্রিডম ফার্স্ট' বা স্বাধীনতা সর্বাগ্রে। মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কারার উপায় নেই। কিন্তু সমতা ভিন্ন স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অসম্ভব। ব্যক্তি এবং বাণিজ্যের স্বাধীনতা এক বিষয় নয়। ব্যক্তি স্বাধীন হলেও সে কিন্তু বাণিজ্যের হাতে বন্দি। কারণ বাণিজ্য কাঠামোর প্রবণতাই থাকে সর্বোচ্চ মুনাফা, কর ফাঁকি, পরিবেশ-প্রতিবেশ বাঁচানোর দায়িত্ব ফাঁকি দেওয়া। ফলে মুক্তবাজার অর্থনীতি বাণিজ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও ব্যক্তির স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে না। উদার গণতন্ত্রের এই স্ববিরোধ প্রণিধানযোগ্য।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উদার গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু নাগরিকের এ স্বাধীনতাচর্চার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। গণমাধ্যম মানেই কোনো না কোনো করপোরেট সংস্থার মালিকানাধীন, তাই নানা শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ। ফলে কোনটা প্রকৃত জনস্বার্থ, কোনটা করেপোরেট স্বার্থ, চেনা কঠিন হয়ে যায়। ভোটে নাগরিকের মতামতের বিশুদ্ধ প্রতিফলন ঘটার উপায়ও সীমিত। যেখানে শাসকদের আছে নিজস্ব বুদ্ধিজীবী, যাদের হাতে আছে বয়ান উৎপাদনের যন্ত্র, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এগুলোকে ব্যবহার করে নাগরিকদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রভাবিত করে সেই অধিপতি শ্রেণি, যাকে আন্তনিও গ্রামসি বলছেন– সম্মতির মাধ্যমে শাসন (হেজেমনি)। সেখানে নাগরিকদের স্বাধীন চিন্তা বা মতপ্রকাশ বাস্তবসম্মত নয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষার হার নিম্ন এবং দারিদ্র্যের উচ্চ। এখানে সব প্রতিষ্ঠানের ওপর শাসকের নিয়ন্ত্রণ বেশ কড়া। গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে পরিচালনা করতে হয়। কখনও রাষ্ট্রীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় আইন এলিট শ্রেণির উদ্দেশ্য পূরণে বেশি কার্যকর। ফলে মত ততটুকু প্রকাশ করা যায় যতটুকু শাসন কাঠামোর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর আরেকটা সমস্যা হলো, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল। ফলে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শাসন কাঠামো। দলীয় আনুগত্যের নামে চলে শীর্ষ ব্যক্তিত্বের নিরঙ্কুশ আনুগত্য। তার মত ছাড়া এখানে ফুল ফোটে না, পাখিও ডাকে না। ফলে গণমুখী বা জবাবদিহিমূলক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা থেকে যায় সুদূরপরাহত। একই সঙ্গে বহুদলীয় গণতন্ত্রের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক

পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একভাবে চালু থাকলেও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানেই পুনরায় প্রশ্নবিদ্ধ হয় উদার গণতন্ত্র।

গণঅভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়া সরকারের আমলে 'উন্নয়ন আগে নাকি গণতন্ত্র আগে'– এ প্রশ্ন যে বারবার উঠেছে তার কি কোনো ভিত্তি ছিল না? সামরিক শাসনও এখানে বারবার জেঁকে বসেছে এই বিভ্রম তৈরি করেই। নাগরিক সমাজের যে অংশ আওয়ামী লীগ সরকারকে গণতন্ত্র না দেওয়ার জন্য তুলাধুনা করেছে, তারা কি সম্প্রতি বিদায় নেওয়া অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ জনগণের ইচ্ছার বিপরীতে দীর্ঘায়িত করতে চায়নি? আওয়ামী লীগ সরকার বলেছে, গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দিতে গেলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না। আর ওই নাগরিকরা বলেছেন, নির্বাচনের জন্য তাড়াহুড়া করলে সংস্কার হবে না; অথচ গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত নির্বাচন।

পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়নঃ

ইউরোপ, আমেরিকান বিধর্মী নাস্তিকরা সবসময় ইসলামের শত্রু, মুসলিমদের শত্রু। পশ্চিমারা কখনোই চায় না মুসলিমরা ভালো থাকুক। এরা চায়ঃ

*নারীদের ঘর থেকে বের করা,

*অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া,

*পরিবার গঠন না করতে,

*নারী পুরুষের সমান অধিকার,

*বাচ্চাদের ব্রেইন ওয়াশ,

*সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা

এপস্টেইন ফাইলঃ ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী প্রকাশিত Epstein Files Transparency Act জেফরি এপস্টেইনের যৌন পাচার ও প্রভাবশালী ক্লায়েন্টদের সাথে সম্পর্কিত ৩০ লাখেরও বেশি পৃষ্ঠার নথি, ১ লাখ ৮০ হাজার ছবি এবং ২ হাজার ভিডিও ফাইল। এই নথিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম বারবার উঠে এসেছে, যা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এপস্টেইন ফাইল নিয়ে মূল তথ্যসমূহ:

- সংগ্রহ ও প্রকাশ: মার্কিন বিচার বিভাগ ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক কেস, এফবিআই তদন্ত এবং এপস্টেইনের মৃত্যুর তদন্ত থেকে এই তথ্যগুলো সংকলন করেছে।
- আলোচিত ব্যক্তিরা: নথিতে বিল গেটস, ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রিন্স অ্যান্ড্রু এবং অন্যান্য অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম রয়েছে।
- ট্রাম্পের সংশ্লিষ্টতা: নথিতে ট্রাম্পের নাম শত শত বার এসেছে এবং ১৯৯০-এর দশকে এপস্টেইনের বিমানে তার ভ্রমণের তথ্য রয়েছে।
- বিতর্ক: অনেক তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে (redacted) বলে ডেমোক্র্যাট এবং কিছু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা এবং এপস্টেইনের শিকাররা এই প্রকাশের সমালোচনা করেছেন।
- তদন্তের ফলাফল: এই ফাইলগুলো প্রকাশের পর থরবজর্ন জ্যাগল্যান্ড, প্রিন্স অ্যান্ড্রু, এবং পিটার ম্যান্ডেলসনের মতো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এপস্টেইন ফাইল প্রকাশিত হওয়ার পরে এতো প্রমান থাকা সত্ত্বেও মানবাধিকার আইনে এদের কোনো বিচার হয় না। অথচ এরা আবার নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে বুলি আওড়ায়।

সেকুলারিজম(ধর্মনিরপেক্ষতা)ঃ

এটি একটি রাজনৈতিক নীতি বা আদর্শ, যা রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা রাখার কথা বলে। অর্থ্যাৎ খুব প্রচলিত একটি কথা শোনা যায় তা হলো "ধর্ম যার যার উৎসব সবার"। সেকুলাররা বোঝাতে চায় একজন মুসলিম হিন্দু ধর্মের পুজা উৎযাপন করবে। কিন্তু সেকুলাররা এটা বলে না যে মুসলিমদের ঈদুল আজহা উৎযাপনে হিন্দু ধর্মের অনুসারী রা আসবে। মূলত সেকুলারিজম আলাদা একটা নাস্তিক্যবাদ ধর্ম। এই সেকুলাররা অন্ধভাবে পশ্চিমাদের ফলো করে। বাংলাদেশেও এই ধর্মের অনুসারী কম নয়। শাহবাগী,বাম রা মূলত এক একজন সেকুলার। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের মৌলিক চার নীতির মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে স্থান দেওয়া হয়েছে। এরপর সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে এ নীতিটি বাদ দিয়ে তার স্থলে আনা হয়েছে 'মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। কিন্তু তিন দশক পর আবারো বর্তমান সরকার 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে ফিরিয়ে এনেছে এবং ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে "মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"-এর নীতিটি। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থবোধক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হল, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যা সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বক্তব্য। এবং প্রায় ৯০% মুসলমানের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়ন গণতন্ত্র, মানবাধিকার পরিপন্থী কাজ। আর দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ও মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া এবং এটিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা বাস্তবতা বিবর্জিত হঠকারিতা ও সীমিত সংখ্যক লোকের মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর। যারা এমনটি করছে তারা কিন্তু প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংকীর্ণ করছে।

ডিভাইস আসক্তিঃ

ডিভাইস আসক্তি বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের (মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ,টিভি) প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীলতা বর্তমান সময়ে একটি বড় মানসিক ও আচরণগত সমস্যা। এটি ব্যবহারকারীকে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ও নেশাগ্রস্ত করে তোলে, যা শারীরিক সমস্যা, পড়াশোনায় অমনোযোগ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং মেজাজ খিটখিটে হওয়ার মতো গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ডিভাইস আসক্তির কারনে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবারগুলো। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় এই ডিভাইসের কারনে। ডিভাইস অাসক্তির লক্ষনগুলো হলোঃ

অতিরিক্ত ব্যবহার: প্রয়োজন ছাড়াও দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা বা বা বারবার ডিভাইস চেক করা।

উদ্বেগ ও বিরক্তি: ফোন কাছে না থাকলে বা ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে তীব্র উদ্বেগ, অস্থিরতা, বা আগ্রাসী আচরণ (Nomophobia)।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের সাথে সময় না কাটিয়ে ভার্চুয়াল জগতে ব্যস্ত থাকা।

সময়ের জ্ঞান হারানো: ডিভাইসে কাজ শুরু করে কতক্ষণ পার হলো তা বুঝতে না পারা।

শারীরিক সমস্যা: ঘাড় ব্যথা, চোখের সমস্যা (Eye strain), এবং ঘুমের ব্যাঘাত।

সাইবার বুলিংঃ সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বেশি আসক্ত হয়ে পরলে সাইবার বুলিং এর স্বীকার হতে হয় মাঝে মাঝে।

মাদকাসক্তিঃ

আধুনিক সমাজের এক অন্যতম চ্যালেন্জের নাম মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি হলো মাদকদ্রব্যের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা, যা একটি জটিল মস্তিষ্কজনিত রোগ। এটি মূলত মস্তিষ্কের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে এবং বারবার মাদক গ্রহণে বাধ্য করে, যা স্বাস্থ্যের, সম্পর্কের ও জীবনের মারাত্মক ক্ষতি করে। এটি থেকে নিরাময়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা, থেরাপি ও পুনর্বাসন প্রয়োজন।

মাদকাসক্তির প্রধান দিকসমূহ:

- সংজ্ঞা: মাদকাসক্তি হলো এমন একটি জৈব-মানসিক অবস্থা, যেখানে মাদক গ্রহণ বন্ধ করলে প্রত্যাহারজনিত বা 'উইথড্রয়াল' (withdrawal) উপসর্গ দেখা দেয়।
- মস্তিষ্কের রোগ: গবেষকরা মাদকাসক্তিকে 'ক্রনিক রিল্যাপসিং ব্রেন ডিজিজ' (chronic relapsing brain disease) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা মস্তিষ্কের আনন্দ কেন্দ্র বা ডোপামিন সিস্টেমকে প্রভাবিত করে।
- কারণসমূহ: কৌতুহল, বন্ধুদের চাপ, পারিবারিক সমস্যা, মানসিক চাপ, অবসাদ বা হতাশা থেকে অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।
- লক্ষণ: নিয়মিত মাদক সেবনের তীব্র ইচ্ছা, নেশার টাকার জন্য অনৈতিক কাজ, দায়িত্ব অবহেলা, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন।
- চিকিৎসা ও প্রতিকার: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, ডিটক্সিফিকেশন, কাউন্সিলিং (থেরাপি), এবং পরিবার-পরিজনদের সহযোগিতা ও সঠিক পুনর্বাসন আসক্তি মুক্তির জন্য জরুরি।

মাদকাসক্তি কেবল ব্যক্তির ক্ষতি করে না, এটি সমাজ ও তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি বড় হুমকি। সঠিক চিকিৎসা ও সামাজিক সচেতনতাই এর একমাত্র সমাধান।

মর্ডানিজম(আধুনিকতা)ঃ

মডার্নিটি সময়কালটা ঠিক কবে থেকে শুরু তা নিয়ে অনেক মত আছে। সাল হিসেব না করে বরং কী কী জিনিসকে মডার্নিটি বলা হয়, সেটা ধরে এগোলে বুঝা সহজ। তাই মডার্নিটিকে মডার্নিজম বলতে পছন্দ করেন অনেকে। এই যে কথায় কথায় আপনারা শুনতে পান: 'একুশ শতকে এসে পুরোন চিন্তা নিয়ে পড়ে আছো', 'আধুনিক হও', 'আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান'। কখনও ভেবেছেন কী এই আধুনিক/আধুনিকতা? এর মানে কি জাস্ট 'নতুন', 'সাম্প্রতিক', 'নয়া'? নাকি এর পিছনে আছে অন্য কোনো চিন্তা-দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গি?

মডার্নিজমের জন্মঃ মডার্নিজম একটা বিশেষ ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামো। খৃষ্টবাদের সাথে টানাপোড়েনে ইউরোপ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তি-উন্নতির একটা চিন্তা জন্ম নিয়েছে। রেনেসাঁ হয়ে এনলাইটেনমেন্ট হয়ে শিল্পবিপ্লব হয়ে গত ৮০০ বছর ধরে এই চিন্তাকাঠামোটা জন্ম নিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই নাম দেয়া হয়েছে 'সভ্যতা' এবং উপনিবেশী শাসনের মওকায় অ-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর উপরে এই 'সভ্যতা'টাকে চাপানো হয়েছে। অথচ প্রয়োজন মনে করা হয়নি 'নেটিভরা এই ব্যবস্থা চায় কি না', 'নেটিভদের অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন কি না'। উইলিয়াম হান্টার, কর্নেল থমাস মুনরো, উইলিয়াম বোল্টস সহ একাধিক রাজপুরুষ উল্লেখ করেছেন: ভারতীয়দের সভ্যতা-মূল্যবোধ-শিক্ষাদীক্ষা ইউরোপের চেয়ে উন্নত না হলেও কোনো অংশে কমও নয়। অথচ এই নেটিভদের সভ্যতাকে 'দানবীয়'রূপে ইউরোপে তুলে ধরবার জন্য নিরলস খেটেছে ওরিয়েন্টালিস্টরা। ইউরোপে এবং ইউরোপমনা নেটিভদের কাছে এসব সভ্যতাকে অসভ্য, বর্বর, ইতর, নারীবিদ্বেষী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে এসব অসভ্যদের সভ্য করার জাস্টিফিকেশন। এভাবেই অর্গানিক সমাজ-কাঠামো ও মূল্যবোধগুলোকে দানব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আধুনিক দুনিয়ায় দানবত্ব হল: তালব্য-ন, কিউ, জ.ঙ্গি। কাউকে দানব বানাতে এগুলো দাগা হয়। যারা মডার্নিটির বিরুদ্ধে কথা বলতে চায়, এই চাপিয়ে দেয়া সভ্যতাকে প্রশ্ন করতে চায়, আত্মপরিচয় খুঁজতে চায়, তাদেরকে দানব প্রমাণ করা হয়। এবং সরিয়ে দেয়া, পুরে ফেলার জাস্টিফিকেশন হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি মুসলিম মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনেকে টিটকারি দিয়েছে। অথচ ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যার পর বাইরে থাকবে না, হায়া, পর্দা এগুলো ট্রেডিশনাল হিন্দু সমাজেরও মূল্যবোধ।

বাবামায়ের মুখে আজও গ্রামের কোনো বিশেষ সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারীর গল্প শুনতে পাবেন যার চেহারা কেউ কোনোদিন দেখেনি। আমি শুনেছি। আজও গ্রামের হিন্দু মেয়েরা এতো লম্বা করে টেনে ঘোমটা দেয় যে চেহারা দেখা যায় না। মডার্নিটি শুধু ইসলামের বিরুদ্ধেই নয়, বরং প্রতিটি ট্রেডিশনাল সমাজের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। বিংশ শতকের শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ প্যাপাল বুল আছে মডার্নিজমের সাথে চার্চের মোকাবেলা কীভাবে হওয়া দরকার সেসব নিয়ে। খৃষ্ট সমাজকেও মডার্নিটি শেষ করে দিয়েছে, যেভাবে দিয়েছে হিন্দু সমাজকে। হিন্দুরাও যদি আসল শত্রুকে না চেনে (মডার্নিজম), তাহলে হিন্দুসমাজও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ইউরোপের মতো।

ডিপ্রেশন(হতাশা)ঃ

অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি, হারাম রিলেশনশিপ, মাদকাসক্তি, এসবের কারনে আজ প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন ই হতাশায় ভুগছে। এই ডিপ্রেশন ই একটা সময় আত্মহত্যার কারন হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম হতাশাকে নিরুৎসাহিত করে এবং একে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশার লক্ষণ হিসেবে গণ্য করে। ইসলাম অনুযায়ী, হতাশা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য এবং মুমিনরা কখনো নিরাশ হন না। কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে" (সূরা ইনশিরাহ ৯৪:৬)। চরম বিপদেও আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের দায়িত্ব।
হতাশা নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

- আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া: আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না" (সূরা জুমার ৩৯:৫৩)। হতাশা আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাসের শামিল।
- পরীক্ষা ও ধৈর্যের পরীক্ষা: জীবনে বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট আসা স্বাভাবিক এবং এটি ঈমানের পরীক্ষা। নবী মুহাম্মদ (সা.)-ও দুঃখের সময় (আমুল হুজন) পার করেছেন, যা প্রমাণ করে যে মানসিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।
- হতাশা দূর করার উপায়:
    - আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল): যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট (সূরা তালাক ৬৫:৩)।

- ধৈর্য ও সালাত: ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া (সূরা বাকারা ২:১৫৩)।
- দোয়া: দুশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করা,
- পেশাদার সাহায্য: আধ্যাত্মিক চর্চার পাশাপাশি প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। সংক্ষেপে, ইসলাম হতাশার মুহূর্তে মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার, ধৈর্য ধরার এবং কর্মতৎপর থাকার নির্দেশ দেয়।

ইসলামোফোবিয়াঃ

ইসলামোফোবিয়া (Islamophobia) হলো ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদের প্রতি চরম ভয়, ঘৃণা, কুসংস্কার এবং বিদ্বেষমূলক মনোভাব। এটি এক ধরণের বর্ণবাদ, যার ফলে মুসলিম বা মুসলিম বলে প্রতীয়মান ব্যক্তিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্য, হয়রানি এবং সহিংসতার শিকার হতে হয়।

ইসলামোফোবিয়ার প্রধান দিকগুলো:

- সংজ্ঞা ও স্বরূপ: এটি ইসলামকে একটি পশ্চাৎপদ, সহিংস বা পাশ্চাত্য মূল্যবোধের বিরোধী হিসেবে চিত্রিত করে।
- কারণ: চরমপন্থী গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড, গণমাধ্যমে ভুল উপস্থাপনা, এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এটি বৃদ্ধি পায়।
- প্রভাব: কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, হিজাব বা বোরকা পরা নারীদের ওপর হামলা, মসজিদ ভাঙচুর, অনলাইন ও অফলাইনে ঘৃণ্য বক্তব্য (Hate Speech) ইত্যাদি।
- বিস্তার: পাশ্চাত্য দেশগুলোর পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অমুসলিম প্রধান দেশে এটি একটি বড় সমস্যা। এটি ব্যক্তি ও সমাজের সংহতি নষ্ট করে এবং সমাজে বিভাজন তৈরি করে।

ইসলামোফোবিয়া হলো মুসলিম-বিরোধী বর্ণবাদ যা মুসলিম এবং তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে শতাব্দী প্রাচীন স্টেরিওটাইপের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এর বিস্তার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপের পাশাপাশি চীন, ভারত এবং মায়ানমারের মতো দেশগুলিতেও মুসলমানদের

উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তথাকথিত মুসলিম দেশগুলো তেও প্র্যাকটিসিং মুসলিমরা এর স্বীকার হচ্ছে।

মব ভায়োলেন্সঃ

মব ভায়োলেন্স (Mob Violence) বা দলবদ্ধ সহিংসতা হলো একদল উত্তেজিত বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর বেআইনিভাবে শারীরিক আক্রমণ, নির্যাতন বা হত্যা। একে প্রায়শই 'মব জাস্টিস' বা গণপিটুনি বলা হয়, যেখানে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাৎক্ষণিক বিচার বা রায় কার্যকর করার চেষ্টা করা হয় ।

মব ভায়োলেন্সের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- উত্তেজিত জনতা: একটি ক্ষুব্ধ জনসমষ্টি, যারা সাধারণ বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে,
- আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া: রাষ্ট্রীয় আইন ও পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে বা আইন ভেঙে ফেলার প্রবণতা,
- বিচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ড: কোনো ধরনের আইনি বিচার বা প্রমাণ ছাড়াই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া,
- সহিংসতা: সাধারণত পিটিয়ে, পাথর মেরে বা আগুনে পুড়িয়ে চরম শারীরিক ক্ষতি বা মৃত্যু নিশ্চিত করা,

কারণ ও প্রেক্ষাপট:

মব ভায়োলেন্স সাধারণত গুজব, চরম উত্তেজনা, বা সামাজিক অস্থিরতার কারণে ঘটে। এর পেছনে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, অথবা আইনের শাসনের অভাব কাজ করে।

মব ভায়োলেন্সের কুফল:

এটি সমাজে ভীতি ও অস্থিতিশীলতা তৈরি করে, যা ন্যায়বিচারের পরিবর্তে আইনশৃঙ্খলার চরম অবক্ষয় ঘটায়।

নারী ও পুরুষ সমান অধিকারঃ

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা। তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই।

আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে 'পিছিয়ে পড়া', আর অশ্লীলতাকে বলে 'প্রগতিশীলতা'। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী। ইসলামের আগে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে লোকে লজ্জা পেত, মুখ লুকিয়ে বেড়াত। কেউ কেউ তো এতটাই পাষাণ ছিল যে, নিজের মেয়েশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত!

মেয়েদের মানুষ মনে করা হতো না। একজন পুরুষ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মতোই তার স্ত্রীকেও ছেলে বা অন্য পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। নারীর কথা তারা শুনত না। যদি কোনো নারী ভালো এবং যুক্তির কথা বলত, তাও তারা বলত, 'নারীর কথা শুনলে নাকি পুরুষের মর্যাদা নষ্ট হয়।'

তাদের দৃষ্টিতে নারীর মূল্য ছিল একজোড়া পুরোনো জুতার থেকেও কম।

সেই অন্ধকার যুগে যখন নারীর কোনো দাম ছিল না, তখন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল ﷺ পৃথিবীতে এলেন—মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, হে মানুষ! নারী তোমার লজ্জা নয়—তোমার সম্মান। সে যদি কন্যা হয়—তবে সে তোমার গর্ব। সে যদি বোন হয়—তবে সে তোমার সম্মানিত রক্ত। সে যদি স্ত্রী হয়—

তবে সে তোমার জীবনের সঙ্গী। আর যদি মা হয়—তাহলে তার পায়ের নিচে আছে তোমার জান্নাত।

তিনি এমন সুসংবাদ দিলেন, যা কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি

مَن عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যার ঘরে দুটি কন্যাসন্তান জন্ম নেবে, আর সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলে, ভালো শিক্ষা দেয়, আদব-আখলাক শেখায়, তবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে—ঠিক যেমন দুটো আঙুল পাশাপাশি থাকে। [তিরমিযী : ১৯১৪]

তিনি আরও বললেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে, আর সে তাদের বিষয়ে ধৈর্য ধরবে, খাওয়াবে, পান করাবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কাপড় পরাবে—তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হবে। [ইবন মাজাহ : ৩৬৭০]

অনলাইন সেলিব্রিটিজমঃ

অনলাইন সেলিব্রিটিজম বলতে বোঝায় ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন এবং জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভের একটি অবস্থা। এটি মূলত প্রচলিত টেলিভিশন বা সিনেমার তারকাদের বাইরে সাধারণ মানুষের নিজস্ব কন্টেন্ট তৈরির মাধ্যমে পরিচিতি পাওয়ার একটি ডিজিটাল সংস্কৃতি। দ্বীনি কমিউনিটির মধ্যে ও এই ফিতনা আজ দৃশ্যমান। লেখক,ব্লগার দ্বীনের লিবাসকে ধারন করে সাধারণ মানুষদের মাঝে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে ইন্টারনেট জগতের গুনাহগুলো কী কী–তা আমাদের অজানা নয় এবং আমরা এও জানি যে, এই জগতের গুনাহর স্বরূপ ও ধরণ যেমনই হোক না কেন; তবে এর অধিকাংশই যৌনতা রিলেটেড গুনাহ। হাদিসে এই ফেতনাকে বলা হয়েছে, নারীর ফেতনা। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষায়,

ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجالِ مِنَ النِّساءِ

পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন ফেতনা আমি রেখে গেলাম না। (সহীহ বুখারী ৫০৯৬)

বোঝা গেল, এই ফেতনা অনেক ভয়াবহ। একে নারীর ফেতনা বলা হয়েছে কেন? কেননা, এই ফেতনার প্রধান অবলম্বন নারী এবং যৌনতা। নগ্নতা আর অশ্লীলতা এর প্রধান খোরাক।

আমরা বলি, নেট। যার অর্থ জাল। ফেতনাও এক প্রকার জাল। আমাদের শায়খের ভাষায়, internet নয়, enter net অর্থাৎ, জালে ঢুকো। সেল ফোন তো নয় বরং হেল ফোন। hell অর্থ জাহান্নাম। অর্থাৎ, সেল ফোন দিয়ে, স্মার্ট ফোন দিয়ে এই জালে ঢুকো আর জাহান্নামে প্রবেশ কর।

আমরা এই জালে এখন এতটাই আবদ্ধ যে, এক দুই ঘণ্টার জন্য হয়ত কোথাও বসেছি, তখনও আমাদের চোখ চারিদিক খুঁজে বেড়ায় ওয়াইফাই আছে কিনা। আহ! এই কিছু কাল আগেও যখন কেউ কারো বাসায় মেহমান হত তখন কুশলাদি বিনিময়ের পর কিংবা ঘুমানোর আগে মেজবান আর মেহমানের কথাবার্তা হত অনেকটা এরকম–অজুর ব্যবস্থা অমুক জায়গায়, ওয়াশরুম এদিকে, জায়নামাজ লাগবে কিনা ইত্যাদি। এই প্রজন্মের কাছে এগুলো এখন গল্প। আরো কিছুকাল পর মনে হবে এসবই কল্পকাহিনী। কেননা, এখনকার মেজবান আর মেহমানের কথাবার্তা হয় অনেকটা এরকম–ওয়াইফাই লাগবে? পাসওয়ার্ডটা কত? ইত্যাদি। ওয়াইফাইর পাসওয়ার্ড কেন দেয়া-নেয়া হয়, এটা তো ওপেন সিক্রেট। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

المرأةُ عورةٌ

নারী হচ্ছে 'আওরাত' তথা আবরণীয়। (সুনান তিরমিযী ১১৭৩)

এজন্যই নারী তার ঘরেই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। আমরা পুরুষরা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হই কখন? যখন সিজদা দেই তখন। আর নারীরা যখন পর্দার সঙ্গে ঘরে অবস্থান করে তখন চব্বিশ ঘণ্টা এই সিজদার সাওয়াব পেতে থাকে। বিশ্বাস হয় না? তাহলে হাদিস শুনুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ

বান্দা সিজদার সময়ে তার রবের সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। (সহীহ মুসলিম ৪৮২)

অপর হাদিসে মহিলাদের ঘরে অবস্থান করার ব্যাপারে হুবহু একই ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وأقربُ ما تكونُ مِن وَجْهِ ربِّها وهي في قَعْرِ بيتها

নারী সবচেয়ে বেশী সে তার পালনকর্তার নিকটবর্তী থাকে যখন সে নিজ ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। (সহীহ ইবনু খুযাইমা ১৬৮৫ সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৯৮)

পরকীয়াঃ

পরকীয়া হলো বিবাহিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিজ স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সাথে বিবাহবহির্ভূত প্রেম বা শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া। এটি পারিবারিক জীবনে তীব্র অশান্তি, অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে এবং সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় হিসেবে গণ্য হয়। আজ ৯০% পরিবার এই পরকীয়ার স্বীকার হচ্ছে। নারীদের বেপদায় থাকা এবং পুরুষদের চোখের হেফাজত না করার কারনে মূলত আমাদের সমাজে এই ফিতনা গুলো হচ্ছে। এতে ডিভোর্সের রেট দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরকীয়া একটি ভয়াবহ গুনাহ। যার শাস্তি এই গনতান্ত্রিক সমাজ কখনো দিতে পারবে না। পশ্চিমা দেশগুলোতে পারিবারিক কাঠামো এবং বিবাহবিচ্ছেদের বর্তমান চিত্রটি বেশ বৈচিত্র্যময়। একদিকে বিবাহবিচ্ছেদের হার ঐতিহাসিকভাবে অনেক বেশি মনে হলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেখানে কিছু ইতিবাচক ও কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নিচে এর বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

১. বিবাহবিচ্ছেদের বর্তমান প্রবণতা (Divorce Trends):

বিচ্ছেদের হার হ্রাস: অবাক করার মতো বিষয় হলো, গত কয়েক দশকে অনেক পশ্চিমা দেশে (যেমন: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি) বিবাহবিচ্ছেদের হার আসলে কমছে। এর প্রধান কারণ হলো মানুষ এখন অনেক বেশি বয়সে এবং বুঝে-শুনে বিয়ে করছে।

উচ্চ হারের দেশগুলো: তাসত্ত্বেও স্পেন (~৮৫%), রাশিয়া (~৭৪%) এবং ফ্রান্সের (~৫১%) মতো দেশগুলোতে বিচ্ছেদের হার অনেক বেশি । যুক্তরাষ্ট্রে এই হার প্রায় ৪৫%।

গ্রে ডিভোর্স (Grey Divorce): বর্তমানে ৫০ বছর বয়সের বেশি মানুষের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়ছে, যাকে 'গ্রে ডিভোর্স' বলা হয়।

২. পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন:

একক ও ক্ষুদ্র পরিবার: ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমানে সেখানে একক বাবা বা মায়ের (Single-parent) পরিবার এবং সন্তানহীন দম্পতিদের সংখ্যা বাড়ছে।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক: পশ্চিমা সমাজে বিয়ের চেয়ে 'কো-হ্যাবিটেশন' (বিয়ে ছাড়াই একসাথে থাকা) অত্যন্ত জনপ্রিয় । অনেক ক্ষেত্রে সন্তান হওয়ার পরও দম্পতিরা আইনিভাবে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন।

একা থাকা (Living Alone): ইউরোপের অনেক দেশে (যেমন: লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া) অর্ধেকের বেশি মানুষ এখন একাকী বসবাস করে, যা সেখানে একটি বড় জীবনযাত্রার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. পশ্চিমা সমাজের এই অবস্থার কারণ:

ব্যক্তিস্বাধীনতা: সেখানে ব্যক্তিগত সুখ এবং স্বাধীনতাকে পরিবারের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

নারীর স্বাবলম্বিতা: নারীরা আর্থিকভাবে স্বাধীন হওয়ায় তারা অসুখী সম্পর্ক থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে।

ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস: পশ্চিমা দেশগুলোতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মের প্রভাব কমে যাওয়া বিবাহবিচ্ছেদ সহজ হওয়ার অন্যতম কারণ।

সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থাঃ

শুরু করতে হয় সেক্যুলারিজম দিয়ে। কারণ এ শব্দটির সংজ্ঞা হচ্ছে, 'নট রিলেটেড উইথ এনি রিলিজিয়াস এন্ড স্পিরিচুয়াল ম্যাটার।' মানে 'যার ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই'। এমন ব্যক্তি, সমাজ, নীতি ও সংস্থাকে বলে সেক্যুলার।

সেক্যুলারিজম এর সঠিক বাংলা অনুবাদ হবে ধর্মহীনতা। যারা এর অনুবাদ করেন ধর্মনিরপেক্ষতা, তাদের এই অনুবাদে ভিন্ন কিছু বোঝানোর সুযোগ রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানের মূল অংশে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে এটি ধর্মহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং সব নাগরিকের সমান ধর্মীয় অধিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব সেক্যুলারিজমকে নির্দ্বিধায় ইসলামবহির্ভূত একটি মতবাদ বলা যায়, ধর্মহীনতা বলা যায়, আসলেই যে অর্থে এর উদগাতা এটি তৈরি করেছেন। মৌলিক বইপত্র, এনসাইক্লোপেডিয়া ও ডিকশনারিতে এর দার্শনিক ও প্রচারকরা যে সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। এটি সঠিক অর্থে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী মানুষই অনুসরণ করতে পারে না। ধর্মহীন মানুষই কেবল বাস্তব অর্থে সেক্যুলার হতে পারে।

কোনো মুসলমানও পরিবর্তিত এবং ব্যাখ্যামূলক অর্থ ছাড়া যেমন বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা সব মানুষের ধর্মীয় অধিকার লাভ, নিজেদের বানানো এমন অর্থ ছাড়া কোনো

মুসলমান সরাসরি সেক্যুলার হতে পারে না। সেক্যুলারিজম একটি ধর্মহীন মতবাদ। এর প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ধর্মহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। ধর্মীয় জীবনব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা। এই নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শের মোকাবিলা করতে ধর্মগুলোকে বহু কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। তবে একমাত্র ইসলাম এই মতাদর্শের সাথে কম্প্রোমাইজ না করে নিজের স্বকীয়তা নিয়ে টিকে রয়েছে। এই ধর্মহীন মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেই দ্বীন হিসেবে পৃথিবীতে এগিয়ে চলেছে। কারণ, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক ধর্মমাত্র নয়। কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়। আমাদের সাথে কি সরকারের বোঝাপড়া এটা যে, সরকার আমার সন্তানকে আমার ধর্ম শেখাবে না। সরকারকে যে ট্যাক্স আমরা দেই, তাতে কি এমন কোনো শর্ত আছে? কেন আমাকে নিজ দায়িত্বে আমার সন্তানকে আলাদা করে হুজুর রেখে ধর্ম শেখাতে হবে। পূর্ববঙ্গের মুসলিম জাতিসত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওরা কারা যারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে মেজরিটির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে? ধর্ম শিক্ষাকে নতুন শিক্ষা পলিসিতে অগুরুত্বপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা হবে না, মানে ছাত্ররা পড়বে না গুরুত্ব দিয়ে। সারাদিন বিজ্ঞান কপচানো লোকগুলো এই ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এক অবৈজ্ঞানিক ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের সন্তানদেরকে। একদল যারা নিজের ছেলেমেয়েদেরকে ইংলিশ মিডিয়ামে বা বিদেশে পড়তে পাঠিয়ে আমাদের সন্তানদেরকে পঙ্গু, অসুস্থ করে তোলার শিক্ষাপলিসি তৈরি করেছে। যাতে তারা ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে একজন ব্যর্থ মানুষ হয়ে যায়, জাতি হয়ে যায় ব্যর্থ, পঙ্গু।

রিবা(সুদ)ঃ

আধুনিক সমাজে সুদ একটি ভয়ংকর রকমের চ্যালেন্জ। সেকুলার রাষ্ট্র পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এর থেকে দূরে থাকা যেনো কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আধুনিক সমাজ মনে করে সুদ না থাকলে ব্যবসা-বানিজ্য করা যাবে না, ,ঋন পাওয়া যায় না, ,দারিদ্র্যতা চলে যায়। অথচ এই ইন্টারেস্ট, কিস্তি, বীমা এসবের নামে শুধু আমাদের সাথে ধোঁকা ই হচ্ছে প্রতিনিয়ত। জেনেশুনে সুূদ খাচ্ছি আমরা। কিন্তু ইসলামে সুদকে 'রিবা' বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ—বৃদ্ধি, অতিরিক্ত বা প্রবৃদ্ধি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, ঋণ বা লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শ্রম বা বিনিময় ছাড়া মূলধনের উপর শর্তযুক্তভাবে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হয়, তা-ই সুদ। এটি সম্পূর্ণ হারাম এবং একটি কবিরা গুনাহ।

সুদ সম্পর্কে ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি:

- কঠোর নিষেধাজ্ঞা: পবিত্র কোরআনে সুদের ভয়াবহতা বর্ণনা করে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সূরা আল-বাকারাহ-এর ২৭৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন এমনভাবে দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে।
- কেন হারাম: সুদের কারণে সমাজে সম্পদ কুক্ষিগত হয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ে এবং বিনা পরিশ্রমে অন্যের সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ তৈরি হয়, যা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য: ইসলাম ব্যবসাকে হালাল করেছে এবং সুদকে হারাম করেছে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান উভয়েরই ঝুঁকি থাকে, কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে মূলধন প্রদানকারী নিশ্চিত অতিরিক্ত আয়ের নিশ্চয়তা পায়, যা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

সুদের প্রকারভেদ:

ইসলামে প্রধানত দুই ধরনের সুদের কথা উল্লেখ রয়েছে:

১. রিবা আল-নাসিয়াহ: নির্দিষ্ট সময়ের বিনিময়ে ঋণের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ বা সুদ নেওয়া বা দেওয়া হয়। (এটি সাধারণত প্রচলিত ব্যাংকিং সুদ বা মহাজনি প্রথার মতো)।

২. রিবা আল-ফজল: একই জাতীয় পণ্য (যেমন: স্বর্ণ, গম বা খেজুর) কম-বেশ করে বা বাকিতে সরাসরি হাতবদল করার সময় যে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা হয়।

অধ্যায় ৪ঃ সমাধান এবং তথ্যসূত্র

শরীআ আইন বাস্তবায়নঃ

একটি মুসলিম দেশে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন নিছক কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়, বরং ইবাদত ও দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়। এর গুরুত্ব মূলত কয়েকটি দিক থেকে বিচার করা হয়:

১. ঈমানের দাবি ও আনুগত্যঃ

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালা কেবল ইবাদতের যোগ্য নন, বরং তিনিই একমাত্র চূড়ান্ত আইনদাতা (হাকিম)। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারা কাফির/জালিম/ফাসিক" (সূরা মায়েদাহ)। তাই একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং তা সমাজে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা ঈমানের দাবি।

২. সামাজিক ন্যায়বিচার (Justice) প্রতিষ্ঠাঃ

শরীয়াহ আইনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার রক্ষা করা (মাকাসিদুশ শরীয়াহ):

- জীবন রক্ষা: হত্যার বদলে কিাসাস বা কঠোর শাস্তির মাধ্যমে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- সম্পদ রক্ষা: চুরি বা আত্মসাতের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির মাধ্যমে মানুষের পরিশ্রমের সম্পদ নিরাপদ করা।
- বংশধারা রক্ষা: ব্যভিচার রোধ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে পবিত্র সমাজ গঠন।
- বিবেক/বুদ্ধি রক্ষা: মাদক বা ক্ষতিকর বস্তু নিষিদ্ধের মাধ্যমে মানুষের সুস্থ চিন্তার পরিবেশ বজায় রাখা।
- ধর্ম রক্ষা: আকিদা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং মর্যাদা রক্ষা করা।

৩. ইনসাফ ও সাম্যঃ

শরীয়াহ আইনে ধনী-দরিদ্র বা রাজা-প্রজার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রাসূল (সা.) বলেছিলেন, যদি তাঁর মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, তবে তিনি তার ওপরও আল্লাহর

আইন প্রয়োগ করতেন। এই কঠোর সাম্য নিশ্চিত করার জন্যই ইসলামে শরীয়াহ আইন জরুরি।

৪. পরকালীন মুক্তিঃ সমাজ বা রাষ্ট্রে যখন আল্লাহর আইন অবহেলিত হয়, তখন সেখানে বিশৃঙ্খলা ও অাল্লাহর গজব নেমে আসে। আর যারা বিচারক বা দায়িত্বশীল, পরকালে আল্লাহর কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে যে তারা কেন ন্যায়বিচার (শরীয়াহ) কায়েম করেনি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে ওলামাদের মত:

অধিকাংশ ইসলামি স্কলার ও বর্তমান সময়ের আলেমদের মতে, শরীয়াহ আইন হুট করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। এটি বাস্তবায়নের আগে কয়েকটি ধাপ প্রয়োজন:

- দাওয়াত ও শিক্ষা: মানুষের মনস্তত্ত্ব পরিবর্তন এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।
- পরিবেশ তৈরি করা: শরীয়াহর শাস্তি প্রয়োগের আগে এমন এক অভাবমুক্ত সমাজ গড়া যেখানে মানুষকে পেটের দায়ে চুরি করতে না হয়।
- জনমতের গুরুত্ব: জোর করে নয়, বরং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করা।

সারসংক্ষেপে, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একটি শান্তিময়, দুর্নীতিমুক্ত ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য বা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রী ম্যারেজ কাউন্সিলিংঃ

বিবাহপূর্ব কাউন্সিলিং বা প্রি-ম্যারিটাল কাউন্সিলিং হলো বিয়ের আগে দম্পতিদের জন্য একটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া, যা দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়তে সাহায্য করে । ইসলামে একে একটি দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়, কারণ এর মূল লক্ষ্য হলো "প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা" গ্রহণ করা, যেন পরবর্তীতে বিচ্ছেদ বা বড় কোনো কলহ তৈরি না হয়।

১. প্রি-ম্যারিটাল কাউন্সিলিং কেন প্রয়োজন?

- ভুল ধারণা দূর করা: অনেক সময় বিয়ের পর সঙ্গীর থেকে মাত্রাতিরিক্ত বা অবাস্তব প্রত্যাশা থাকে, যা কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়,
- যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি: একে অপরের কথা শোনার ও বোঝার মানসিকতা তৈরি হয়,
- মতবিরোধ নিরসন: দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে (যেমন—টাকা-পয়সা, শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্ক) বিয়ের আগেই আলোচনা করে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়,
- ইসলামী দায়বদ্ধতা: ইসলামে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা জরুরি, যা কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে জানা যায়।

২. প্রধান আলোচনার বিষয়সমূহঃ

কাউন্সিলিং সেশনগুলোতে সাধারণত নিচের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়:

- আর্থিক পরিকল্পনা: পারিবারিক ব্যয় ও উপার্জনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা,
- পারিবারিক ভূমিকা: স্বামী ও স্ত্রীর ঘরোয়া দায়িত্ব বণ্টন,
- সন্তান ও লালন-পালন: ভবিষ্যৎ সন্তান গ্রহণ ও তাদের ইসলামী পরিবেশে বড় করার পরিকল্পনা,
- মানসিক ও শারীরিক সামঞ্জস্য: ভয় ও আবেগীয় সংযোগ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা।

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনঃ

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। মহানবী (সা.) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ" (ইবনে মাজাহ)। ইসলামে এই জ্ঞান অর্জনকে কেবল তথ্য জানা নয়, বরং নিজেকে এবং স্রষ্টাকে চেনার মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়।

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রধান কিছু উপায় ও ক্ষেত্র নিচে দেওয়া হলো:

১. প্রধান উৎসসমূহঃ

- কুরআন মাজীদ: অর্থ ও তাফসীরসহ কুরআন পড়া হলো ধর্মীয় জ্ঞানের মূল ভিত্তি। এটি সরাসরি আল্লাহর কথা, যা জীবন পরিচালনার গাইডলাইন।
- হাদিস শরীফ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও সম্মতি সম্পর্কে জানা। বুখারী, মুসলিম বা রিয়াদুস সালিহীন পড়ার মাধ্যমে সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর ধারণা পাওয়া যায়।
- ফিকহ (ইসলামি আইন): দৈনন্দিন জীবনের ইবাদত (নামাজ, রোজা, জাকাত) এবং লেনদেন সঠিকভাবে করার জন্য প্রাথমিক ফিকহ বা মাসআলা-মাসায়েল জানা জরুরি।

২. জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমঃ

- নির্ভরযোগ্য আলেমদের সাহচর্য: সরাসরি কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে শেখা সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা কম থাকে।
- বই পড়া: নির্ভরযোগ্য প্রকাশনীর সিরাত (রাসূলের জীবনী), সাহাবীদের জীবনী এবং আকীদা বিষয়ক বই পড়া।
- অনলাইন কোর্স ও লেকচার: বর্তমানে অনেক বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্মে ঘরে বসেই সহীহ দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। তবে ইন্টারনেটে তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

৩. জ্ঞান অর্জনের আদব (শিষ্টাচার)ঃ

- ইখলাস বা নিয়ত: জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং নিজের জীবন সংশোধন করা, অন্যকে তর্কে হারানো নয়।
- বিনয়: মনে রাখতে হবে, জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হলো নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া।

- আমল করা: যেটুকু জানবেন, সেটুকু জীবনে প্রয়োগ করাই হলো প্রকৃত জ্ঞান বা 'ইলম নাফে'।

৪. পারিবারিক পর্যায়ঃ

পরিবারে প্রি-ম্যারেজ কাউন্সিলিং-এর মতো ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ রাখাও জরুরি। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ইসলামের মৌলিক জ্ঞান দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব।

দেনমোহর আদায় নিশ্চিতকরণঃ

ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী দেনমোহর কোনো দয়া বা উপহার নয়, বরং এটি স্ত্রীর একটি আইনি অধিকার এবং স্বামীর ওপর একটি বাধ্যতামূলক ঋণ। এটি আদায় নিশ্চিত করতে ইসলাম কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে:

১. দেনমোহর পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক (ফরজ)ঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন: "আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করো।" (সূরা নিসা: ৪)। এটি আদায় না করাকে ইসলামে গুনাহ এবং অন্যের হক আত্মসাতের শামিল করা হয়েছে।

২. ঋণ হিসেবে গণ্য করাঃ ইসলামি বিধান অনুযায়ী, দেনমোহর স্বামীর ওপর একটি ঋণের মতো। স্বামী যদি এটি পরিশোধ না করে মারা যান, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে উত্তরাধিকারীদের অংশ বণ্টনের আগেই সর্বপ্রথম দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় স্বামী কিয়ামতের দিন 'ঋণগ্রস্ত' বা 'চোর' হিসেবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন বলে হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে।

নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রদানঃ

ইসলামে নারীর প্রকৃত মর্যাদা কেবল স্লোগান নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি জীবনবিধান। অন্ধকার যুগে যখন নারীদের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, ইসলাম তখন তাদের মানুষ হিসেবে পূর্ণ অধিকার ও সম্মান দান করেছে। নারীর প্রকৃত মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের প্রধান দিকগুলো হলো:

১. আধ্যাত্মিক ও মানবিক সমমর্যাদাঃ আল্লাহর কাছে নারী ও পুরুষ মানুষ হিসেবে সমান । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ভালো কাজের প্রতিদান এবং পরকালীন মুক্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। । অনেক ক্ষেত্রে কুরআন সরাসরি 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী' বলে সম্বোধন করে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে,

২. অর্থনৈতিক স্বাধীনতাঃ ইসলাম নারীকে নিজস্ব সম্পদের মালিক হওয়ার এবং তা স্বাধীনভাবে ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে,

- উত্তরাধিকার: পিতা, স্বামী, সন্তান বা ভাইয়ের সম্পদ থেকে নারী নির্দিষ্ট অংশে হিস্যা পান,
- দেনমোহর ও ভরণপোষণ: বিয়েতে দেনমোহর পাওয়া স্ত্রীর একক অধিকার,এছাড়া স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর, এমনকি স্ত্রীর নিজের সম্পদ থাকলেও তিনি তা সংসারে খরচ করতে বাধ্য নন,
- উপার্জন: পর্দা ও শরয়ি বিধান মেনে নারী ব্যবসা বা চাকরি করে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেই অর্থ সম্পূর্ণ তার নিজের।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক সম্মানঃ নারী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলাম তাঁকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে।

- মা হিসেবে: রাসুল (সা.) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত" । বাবার চেয়ে মায়ের সেবাকে তিন গুণ বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- কন্যা হিসেবে: কন্যা সন্তান লালন-পালনকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং জীবন্ত কবর দেওয়ার জাহেলী প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- স্ত্রী হিসেবে: রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম"।

৪. শিক্ষা ও মত প্রকাশের অধিকারঃ জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ । হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম প্রধান শিক্ষক ও ফকীহ। এছাড়া বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োজনে তিনি বিচ্ছেদের (খুলা) আবেদন করার অধিকারও রাখেন।

৫. সুরক্ষা ও আত্মপরিচয়ঃ ইসলামি বিধানে বিয়ের পরও নারী তার বাবার বংশনাম বা পরিচয় পরিবর্তন করেন না, যা তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। পর্দা বা হিজাবকে নারীকে বন্দী করার জন্য নয়, বরং তার সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়,

ইসলাম নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে নয়, বরং একজন স্বাধীন, মর্যাদাবান এবং দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শিক্ষা কারিকুলামে পারিবারিক আইনঃ

শিক্ষা কারিকুলামে পারিবারিক আইন অন্তর্ভুক্ত করা একটি আধুনিক ও দূরদর্শী চিন্তা, যা একটি সুস্থ সমাজ ও স্থিতিশীল পরিবার গঠনে সহায়ক হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার কিছু ক্ষেত্রে এটি থাকলেও, সাধারণ কারিকুলামে এর ব্যাপক অন্তর্ভুক্তির দাবি জোরালো হচ্ছে।

শিক্ষাক্রমে পারিবারিক আইন (বিশেষ করে ইসলামি শরীয়াহ ও দেশের প্রচলিত আইন) যুক্ত করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতাঃ শিক্ষার্থীরা যদি ছাত্রজীবন থেকেই বিয়ে, দেনমোহর, ভরণপোষণ এবং উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পায়, তবে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। বিশেষ করে নারীরা তাদের শরয়ি ও আইনি অধিকার (যেমন—দেনমোহর ও মিরাস) আদায়ে আরও দক্ষ হবে।

২. পারিবারিক কলহ ও বিচ্ছেদ হ্রাসঃ অধিকাংশ দাম্পত্য কলহ শুরু হয় একে অপরের অধিকার ও দায়িত্ব না জানার কারণে। কারিকুলামে 'প্রি-ম্যারিটাল গাইডেন্স' বা পারিবারিক শিষ্টাচার অন্তর্ভুক্ত থাকলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা দীর্ঘমেয়াদে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কমাতে সাহায্য করে।

৩. দেনমোহর ও ভরণপোষণ নিশ্চিতকরণঃ দেনমোহর যে কোনো করুণা নয় বরং স্ত্রীর পাওনা ঋণ, এবং স্ত্রীর যাবতীয় খরচ চালানো স্বামীর ধর্মীয় ও আইনি বাধ্যবাধকতা—এই শিক্ষাগুলো স্কুল-কলেজ পর্যায়ে দিলে একটি দায়িত্বশীল প্রজন্ম গড়ে উঠবে।

৪. উত্তরাধিকার বা মিরাস বণ্টনঃ বাংলাদেশে সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা সবচেয়ে বেশি হয়। কারিকুলামে ইসলামি উত্তরাধিকার আইন (ফারায়েজ) অন্তর্ভুক্ত থাকলে উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট করার প্রবণতা কমবে এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও নৈতিকতাঃ পারিবারিক আইন শিক্ষার মাধ্যমে পারিবারিক মূল্যবোধ সুসংহত হয়। এটি শিক্ষার্থীদের মাদক, ইভটিজিং বা অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রেখে একটি সুশৃঙ্খল জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

৬. বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ধাপসমূহ:

- মাধ্যমিক পর্যায়: ইসলাম শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক অধিকার ও আদবসমূহ যুক্ত করা।
- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়: বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আইন এবং সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- উচ্চশিক্ষা: সাধারণ শিক্ষার সকল শাখায় 'পারিবারিক আইন' নামক একটি আবশ্যিক কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

শিক্ষা কারিকুলামে এই পরিবর্তনগুলো আনতে পারলে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনের সমন্বয় ঘটবে, যা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

পর্দা গাইডলাইনঃ

এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা ও সুরক্ষাকবচ। শরীয়াহ অনুযায়ী পর্দার মূল গাইডলাইন নিচে তুলে ধরা হলো:

১. পুরুষের পর্দা (দৃষ্টির হেফাজত)ঃ পর্দার বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের সম্পর্কে আগে নির্দেশ দিয়েছেন:

- দৃষ্টি অবনত রাখা: কোনো বেগানা (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে না তাকানো।
- লজ্জাচ্ছান রক্ষা: নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ ঢেকে রাখা এবং শালীন পোশাক পরিধান করা।

২. নারীর পর্দার নীতিমালাঃ নারীর পর্দার ক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়াহর প্রধান শর্তগুলো হলো:

- অঙ্গ আচ্ছাদন: মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কবজি এবং কোনো কোনো মত অনুযায়ী দুই পায়ের পাতা ছাড়া সারা শরীর ঢেকে রাখা। (অনেক ওলামার মতে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডলও আবৃত করা উত্তম)।
- পোশাকের ধরণ:
    - পোশাকটি এমন পাতলা হওয়া যাবে না যাতে ভেতরের অঙ্গ দেখা যায়।
    - পোশাকটি শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন টাইট বা আঁটসাঁট হওয়া যাবে না (অঙ্গের গঠন বোঝা না যায়)।
    - পোশাকটি নিজে এত বেশি কারুকাজমণ্ডিত বা উজ্জ্বল হওয়া যাবে না যা পরপুরুষকে আকর্ষণ করে।
- পরিচয় গোপন রাখা: সুগন্ধি বা পারফিউম মেখে বাইরে না যাওয়া, যা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে।

৩. মাহরাম ও নন-মাহরামের বিধানঃ পর্দার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কাদের সামনে যাওয়া যাবে আর কাদের সামনে নয় তা জানা:

- মাহরাম: যাদের সাথে বিয়ে চিরতরে হারাম (যেমন: পিতা, ভাই, ছেলে, দাদা, নানা, শ্বশুর, আপন চাচা-মামু)। এদের সামনে স্বাভাবিক শালীন পোশাকে থাকা যায়।

- নন-মাহরাম: যাদের সাথে বিয়ে বৈধ (যেমন: চাচাতো-মামাতো ভাই, দুলাভাই, দেবর বা অপরিচিত পুরুষ)। এদের সামনে পূর্ণ পর্দা বজায় রাখা জরুরি।

৪. কথা ও আচরণের পর্দাঃ পর্দা কেবল পোশাকে সীমাবদ্ধ নয়,

- পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরকে কোমল বা আকর্ষণীয় না করে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনমাফিক কথা বলা।
- অপ্রয়োজনে একান্তে কোনো নন-মাহরাম পুরুষের সাথে অবস্থান না করা।

৫. পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্যঃ

- আল্লাহর আনুগত্য: এটি স্রষ্টার সরাসরি আদেশ পালন।
- পারিবারিক শান্তি: সমাজ থেকে ব্যভিচার ও অনৈতিকতা দূর করে সুস্থ পারিবারিক কাঠামো রক্ষা করা।
- নারীর মর্যাদা: নারীকে পণ্য হিসেবে নয়, বরং একজন সম্মানিত মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা।

ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টঃ

ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট বা পারিবারিক ব্যবস্থাপনা হলো একটি পরিবারকে সুশৃঙ্খল, সুখী এবং আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলার কৌশল। ইসলামি শরীয়াহ এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি কার্যকর ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টের মূল দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. নেতৃত্বের স্পষ্টতা ও পরামর্শ ঃ

- দায়িত্বশীলতা: ইসলামে পরিবারকে একটি ছোট রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যেখানে স্বামী/বাবা হলেন অভিভাবক। তবে এই নেতৃত্ব একনায়কতন্ত্র নয়, বরং দয়া ও সেবার ওপর ভিত্তি করে।
- পরামর্শ সভা: গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় স্বামী-স্ত্রী এবং বড় সন্তানদের সাথে আলোচনা বা 'শূরা' করা। এতে সবার মধ্যে গুরুত্ব পাওয়ার অনুভূতি তৈরি হয় এবং বন্ধন দৃঢ় হয়।

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Budgeting)ঃ

- হালাল উপার্জন: পরিবারের সুখের প্রথম শর্ত হলো উপার্জনের উৎস বৈধ হওয়া।
- মিতব্যয়িতা: অপচয় রোধ করা এবং আয়ের সাথে ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা।
- স্বচ্ছতা: অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সঞ্চয় সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি, যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

৩. গুণগত সময় প্রদান (Quality Time)ঃ

- পরিবারের সদস্যদের সাথে শুধু এক ঘরে থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং সক্রিয়ভাবে একে অপরকে সময় দেওয়া।
- একসাথে খাবার খাওয়া, দ্বীনি আলোচনা করা এবং মাঝে মাঝে সপরিবারে বাইরে ঘুরতে যাওয়া মানসিক প্রশান্তি বাড়ায়।
- ডিজিটাল আসক্তি (মোবাইল/টিভি) কমিয়ে একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার অভ্যাস করা।

৪. কাজ বণ্টন ও সহযোগিতাঃ

- ঘরের সব কাজ কেবল নারীর ওপর চাপিয়ে না দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা করা। রাসুল (সা.) ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন।

- সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ছোট ছোট দায়িত্ব (যেমন: নিজের বিছানা গোছানো, খাবার গুছিয়ে রাখা) দেওয়া, যাতে তারা দায়িত্বশীল হয়ে গড়ে ওঠে।

৫. দ্বন্দ্ব নিরসন ও ক্ষমাঃ

- বিভেদ বা ঝগড়া হলে তা দীর্ঘস্থায়ী না করা। দ্রুত মিটমাট করে নেওয়ার মানসিকতা রাখা।
- একে অপরের দোষ না খুঁজে গুণের প্রশংসা করা। মনে রাখা যে, নিখুঁত মানুষ কেউ হয় না।

৬. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাঃ

- পরিবারে সম্মিলিত ইবাদতের (যেমন: জামাতে নামাজ বা কুরআন তিলাওয়াত) পরিবেশ রাখা।
- সন্তানদের কেবল একাডেমিক পড়াশোনা নয়, বরং উচ্চতর নৈতিকতা ও শিষ্টাচার (আদব) শেখানো।

৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা (সিলাতুর রাহিম)ঃ

- উভয় পক্ষের (স্বামী ও স্ত্রী) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায় করা। এটি বরকত বাড়াতে সাহায্য করে।

একটি সফল পরিবারের মূলমন্ত্র হলো— ধৈর্য, ত্যাগ এবং একে অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

সুন্নাহভিত্তিক জীবন পরিচালনাঃ

সুন্নাহভিত্তিক জীবন পরিচালনার অর্থ হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শকে অনুসরণ করা। এটি কেবল কিছু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনপদ্ধতি।

সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়ার প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. ব্যক্তিগত অভ্যাস ও পবিত্রতাঃ

- দিনের শুরু ও শেষ: ভোরে ঘুম থেকে ওঠা এবং সুন্নাহ অনুযায়ী ঘুমানোর দোয়া ও আমল করা। ডান কাতে ঘুমানো এবং শোয়ার আগে বিছানা ঝেড়ে নেওয়া সুন্নাহ।
- পরিচ্ছন্নতা: নিয়মিত মেসওয়াক করা, নখ কাটা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা। রাসুল (সা.) সুগন্ধি পছন্দ করতেন।
- খাদ্যাভ্যাস: খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাওয়া এবং দস্তরখান ব্যবহার করা। পেটের এক-তৃতীয়াংশ খালি রেখে খাওয়া সুন্নাহ।

২. ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতাঃ

- ফরজ ও নফল: পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পাশাপাশি সুন্নত ও নফল (যেমন: তাহাজ্জুদ, ইশরাক) নামাজের গুরুত্ব দেওয়া।
- জিকির ও দোয়া: সারাদিনের প্রতিটি কাজের শুরুতে ও শেষে ছোট ছোট মাসনুন দোয়া পড়া (যেমন: ঘরে ঢোকার, বের হওয়ার বা আয়না দেখার দোয়া)।
- কুরআন তিলাওয়াত: প্রতিদিন অর্থসহ অন্তত কিছু অংশ কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তা নিয়ে চিন্তা করা।

৩. আচার-আচরণ ও আখলাক (চরিত্র)ঃ

- হাসিমুখে কথা বলা: রাসুল (সা.) সবসময় হাসিমুখে থাকতেন। অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বলাও একটি সদকা।
- সত্যবাদিতা: ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত সব লেনদেনে শতভাগ সততা বজায় রাখা।
- রাগ নিয়ন্ত্রণ: রাগের সময় চুপ থাকা বা স্থান পরিবর্তন করা। প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৪. পারিবারিক ও সামাজিক সুন্নাহঃ

- স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার: পরিবারে সময় দেওয়া এবং গৃহস্থালি কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা বড় সুন্নাহ।
- প্রতিবেশী ও মেহমানদারি: প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়া এবং মেহমানকে সাধ্যমতো আপ্যায়ন করা।
- সালামের প্রচার: পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে আগে সালাম দেওয়া।

৫. সময় ও কাজ ব্যবস্থাপনাঃ

- পরিকল্পিত জীবন: সময়ের অপচয় না করা। রাসুল (সা.) দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উপকারী নয় এমন কাজ এড়িয়ে চলতেন।
- পরোপকার: মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা এবং অন্যের জন্য সহজতা তৈরি করা।

সুন্নাহ পালনের সহজ উপায়: হুট করে সব পরিবর্তন না করে প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন সুন্নাহ নিজের জীবনে স্থায়ী করার চেষ্টা করতে হবে যেমন—এই সপ্তাহে খাওয়ার আদবগুলো ঠিক করলে, পরের সপ্তাহে ঘুমানোর সুন্নাহগুলো।

দাওয়াহঃ

দাওয়াহ (Dawah) শব্দের অর্থ হলো 'আহ্বান করা' বা 'ডাকা'। ইসলামি পরিভাষায়, মানুষকে আল্লাহর পথে, কল্যাণের পথে এবং ইসলামের সঠিক আদর্শের দিকে আহ্বান জানানোকে দাওয়াহ বলা হয়। এটি কেবল আলেমদের কাজ নয়, বরং প্রতিটি মুসলিমের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

কার্যকর দাওয়াহর জন্য ইসলামি শরীয়াহর কিছু মূল নীতিমালা ও পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো:

১. দাওয়াহর মূল ভিত্তি (কুরআনের নির্দেশনা)ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল: ১২৫)। এখান থেকে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়:

- হিকমত (Wisdom): পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং ব্যক্তির মানসিকতা বুঝে কথা বলা।
- উপদেশ (Good Advice): কঠোরতা না করে দরদ ও ভালোবাসার সাথে বোঝানো।
- সর্বোত্তম বিতর্ক: যদি তর্কের প্রয়োজন হয়, তবে সেখানেও গালিগালাজ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে যুক্তি দিয়ে কথা বলা।

২. আচরণের মাধ্যমে দাওয়াহ (Silent Dawah)ঃ

কথার চেয়ে কাজের প্রভাব বেশি। আপনার সততা, বিনয় এবং সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (আখলাক) দেখে মানুষ যখন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেটিই সবচেয়ে শক্তিশালী দাওয়াহ। রাসুল (সা.)-এর উন্নত চরিত্র দেখেই আরবের বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

৩. দাওয়াহর মাধ্যমসমূহঃ

- ব্যক্তিগত দাওয়াত: বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।
- সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তি: গঠনমূলক পোস্ট, ভিডিও বা লেকচারের মাধ্যমে সহীহ দ্বীনি জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া।

- পারিবারিক দাওয়াত: নিজের পরিবার থেকে শুরু করা। সন্তানদের এবং পরিবারের সদস্যদের দ্বীনি পরিবেশে অভ্যস্ত করা।

৪. দাঈর (আহ্বানকারী) গুণাবলিঃ

- সঠিক জ্ঞান: যে বিষয়ে দাওয়াত দেবেন, সে বিষয়ে আপনার স্পষ্ট ও সহীহ জ্ঞান থাকতে হবে। ভুল তথ্য দেওয়া মারাত্মক গুনাহ।
- ধৈর্য: দাওয়াতি কাজে বাধা বা উপহাস আসতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা এবং মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ না করা।
- আন্তরিকতা (ইখলাস): লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

৫. দাওয়াহর ক্ষেত্রে যা এড়িয়ে চলা উচিতঃ

- জোরজবরদস্তি: ইসলামে কাউকে বাধ্য করার কোনো বিধান নেই।
- হতাশা তৈরি করা: মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না করে আশার বাণী শোনানো।
- ছোটখাটো মতভেদ: ছোটখাটো বা শাখা-প্রশাখা বিষয়ক মতভেদ নিয়ে ঝগড়া না করে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে ঐক্যবদ্ধ করা।

দাওয়াহর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দেওয়া, কাউকে বিচার করা নয়। হেদায়েত দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

গবেষনার সারসংক্ষেপঃ

একটি পরিবার হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ। কিন্তু "আধুনিক সভ্যতা" আর সোশ্যাল মিডিয়ার আগ্রাসনের ফলে এই স্তম্ভ/আজ ধ্বংসের মুখে। মূল শিকড়ে চিড় ধরে গেছে। আর শিকড়বিহীন বৃক্ষ কি কল্পনা করা যায়? তথাকথিত আধুনিকতা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদ। জেঁকে বসছে অশান্তি আর পারিবারিক অস্থিতিশীলতা। আর এগুলোর মূলে রয়েছে দ্বীনবিমুখতা। অধিকাংশ পরিবারে এখন আর দ্বীন ও দাওয়াতের চর্চা হয় না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের চক্ষুশীতলকারী হিসেবে তৈরি করেছেন। সন্তানকে করেছেন তাদের আগামীদিনের মশাল। পারিবারিক জীবনে সুখের মূল হাতিয়ারই হলো- পরিবারে দ্বীনের চর্চা, সহজ-সরল জিন্দেগী, অল্পে তুষ্টি। আজকে মানুষ সাধাসিধা জিন্দেগী অনুসরণ না করায় পুরো পৃথিবীর পরিবারগুলো নিজেদের সৃষ্ট অশান্তির আগুনে জ্বলছে। পরিবার থেকে কোনোভাবেই অভাব দূর হচ্ছে না। রাসূল (সাঃ)-এর জন্মের মাধ্যমে মানবতার পূণর্জন্ম হয়েছিল। তিনি এমন এক ভোর নিয়ে এসেছিলেন যা শিরকের কালোরাতকে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। রাসূল বলেন, দুনিয়াতে তুমি বসবাস করো যেন তুমি দুনিয়া থেকে বহিরাগত কিংবা মুসাফির। (সহীহ বুখারী) রাসূল (সাঃ) ও একদিন মিম্বরে আরোহন করে বললেন, "আমি তোমাদের মুশরিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি না বরং দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় করি।"আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাঃ)-এর জন্য মক্কার পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, "বরং আমি একদিন না খেয়ে থাকব আর একদিন খাবার গ্রহণ করব। অনাহারে থাকলে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করব আর আহার পেলে তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব এবং প্রশংসা করব।" মুসা (আ.) ও তার বিবি একটিমাত্র চামড়ার চাদরে ১০ বছর পর্যন্ত বিছিয়ে রাতে অবিশ্রাম নিতেন ও দিনে উট/বকরিকে খাবার খাওয়াতেন। যখন আল্লাহর রাসূল(সাঃ)-এর সাথে খাদিজা (রা.)-এর বিয়ে হয় তখন তিনি ছিলেন মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য মহিলা। আর দ্বীনের জন্য খাদিজা (রা.)-এর সমস্ত সম্পদ অকাতরে ব্যয় করার পর, মৃত্যুর সময় তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সাথে ছিল আল্লাহর রাসূলের অফুরন্ত ভালোবাসা আর জান্নাতের সুসংবাদ। এমনই ছিল নবী-সাহাবীদের জীবন ও পরিবার। পেটে খাবার ছিল না বটে, কিন্তু পরিবারে শান্তির কোনো অভাব ছিল না। ছিল মায়া-মমতা, ছিল সবার

প্রতি ভালোবাসা। আমাদের ঘরগুলো যেনো সাহাবীওয়ালা ঘর হয়ে যায়। আমাদের পরিবারগুলো যেনো সাহাবীদের মতো পরিবার হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল -এর যে ফিকির (চিন্তাভাবনা, জাহান্নাম থেকে সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মেহনত ও পেরেশানি) ছিল, সারা দুনিয়াতে কীভাবে দ্বীন ছড়িয়ে যেতে পারে- এ নিয়ে সাহাবাদের যে ফিকির ছিল, আমাদের কাঁচা-পাকা সকল ঘরগুলোতেও যাতে এই ফিকির (চিন্তাভাবনা, জাহান্নাম থেকে সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মেহনত ও পেরেশানি) চলে আসে। পরিবার হলো মানব সভ্যতার প্রথম পাঠশালা। ইসলাম এই পাঠশালাকে সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় করার জন্য সুনির্দিষ্ট পারিবারিক আইন প্রদান করেছে। কিন্তু বর্তমান

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন, অবাধ তথ্যপ্রযুক্তি এবং পাশ্চাত্য জীবনবোধের প্রভাবে মুসলিম পারিবারিক কাঠামোতে ফাটল দেখা দিচ্ছে। বিবাহবিচ্ছেদ, নৈতিক অবক্ষয় এবং পারিবারিক সহিংসতা বর্তমান সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী পারিবারিক আইনের প্রাসঙ্গিকতা ও আধুনিক সমস্যার সমাধানে এর কার্যকারিতা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। এই গবেষণায় কুরআন ও হাদিসের সুনির্দিষ্ট রেফারেন্সের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ধাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।বিবাহকে কেবল চুক্তি নয়, বরং একটি ইবাদত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং দেনমোহরকে নারীর আর্থিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।পরিবারে কেবল পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নয়, বরং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও অধিকারের ভারসাম্য রক্ষায় ইসলামের বিধান আলোচনা করা হয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার, যৌতুক প্রথা, এবং লিভ-ইন রিলেশনশিপের মতো আধুনিক সমস্যাগুলো ইসলামী আইনের আলোকে কীভাবে সমাধান করা সম্ভব, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।আধুনিক সমাজে তালাক বাড়ার মূল কারণ দ্বীনদারীর অভাব, ধৈর্যহীনতা এবং পর্দার বিধান লঙ্ঘন।গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ পারিবারিক সহিংসতার মূলে রয়েছে যৌতুক, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। পারিবারিক শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় আইন যথেষ্ট নয়, বরং ব্যক্তিপর্যায়ে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রাক-বিবাহ শিক্ষা এবং ধর্মীয় কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। ইসলামী পারিবারিক আইন কোনো সেকেলে বিধান নয়, বরং এটি আধুনিক ও কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য এক নির্ভুল

সমাধান। পরিশেষে বলা যায় যে,ইসলামী পারিবারিক আইন যে কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং একটি জীবনমুখী সমাধান। বিবাহ, দেনমোহর, উত্তরাধিকার এবং তালাক এগুলোই হচ্ছে গবেষণার মূল বিষয়। ইসলাম পরিবারকে একটি 'দুর্গ'

হিসেবে বিবেচনা করে, যা ব্যক্তিকে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় হতে রক্ষা করে। আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জগুলো বাহ্যিকভাবে জটিল মনে হলেও ইসলামী পারিবারিক আইনের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব। ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অসম প্রতিযোগিতা তৈরি না করে বরং একে অপরের 'পরিপূরক' হিসেবে ঘোষণা করেছে।মানুষের তৈরি আইন যুগের পরিবর্তনে অকেজো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কিয়ামত পর্যন্ত অটল ও কার্যকর। যদি মুসলিম সমাজ আজ পুনরায় কুরআন ও সুন্নাহর পারিবারিক কাঠামোর দিকে ফিরে আসে, তবে সমাজ থেকে ডিভোর্স, আত্মহত্যা এবং পারিবারিক অস্থিরতা দূর হয়ে এক জান্নাতি পরিবেশ তৈরি হবে।

গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছেঃ

১. আধুনিক পারিবারিক অশান্তির মূল কারণ হলো ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরত্ব এবং ভোগবাদী মানসিকতা,

২. ইসলাম প্রদত্ত বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক পদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, যা হুট করে সংসার ভাঙার চেয়ে সমঝোতাকে বেশি প্রাধান্য দেয়,

৩. পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর অংশ নিশ্চিত করা হলে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা বৃদ্ধি পায়,

৪. ইসলামী ‘সালিশি ব্যবস্থা’ কার্যকর করলে আদালতের দীর্ঘসূত্রতা ও পারিবারিক কলহ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব,

৫. সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন এর আইন বাস্তবায়ন করা হলে সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র

বইঃ

*শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)

*দাম্পত্য জীবন

*ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট

*দ্য পারফেক্ট কাপল

*কুরআন

*সীরাহ

ব্লগ সাইট:

*www.shamsularefinsakti.com

*মাসিক আল কাউসার

*মাসিক আত তাহরিক

*muslimbangla.com